সেপ্টেম্বর ২০১৮ ▪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

শুভ জন্মদিন

বিশ্বনন্দিত মনীষার সাফল্যগাথা

মাদার অব হিউম্যানিটি

রোহিঙ্গারা নিজ বাসভূমে পরবাসী

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প: সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

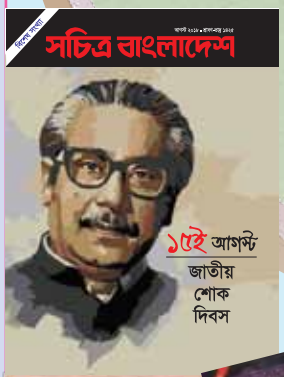

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

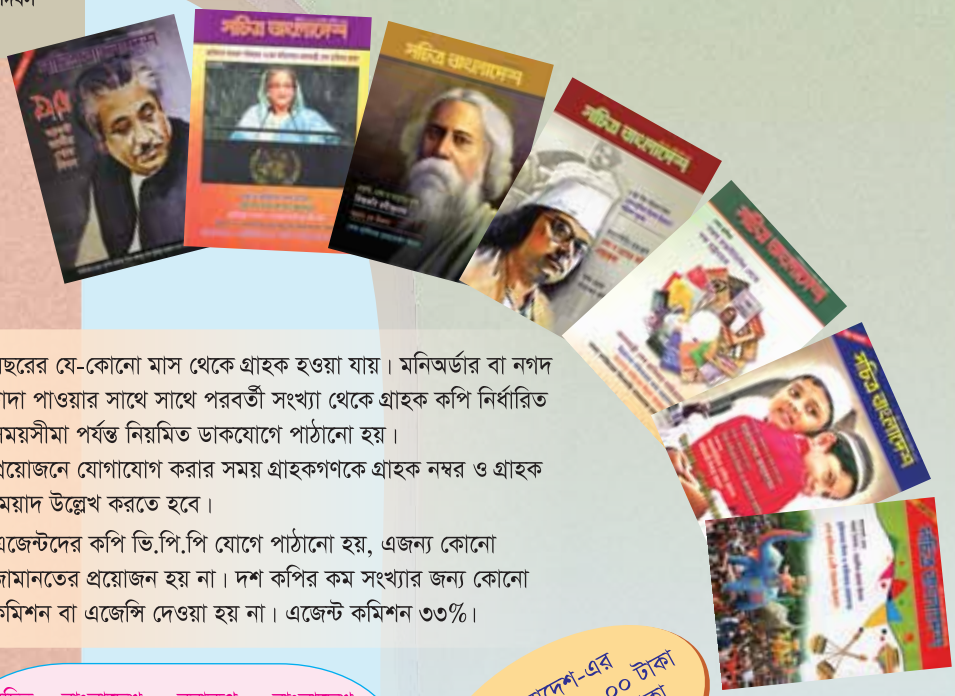

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 03, September 2018, Tk. 25.00

নিরাপদ সড়ক চাই

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা

- দূরপাল্লার বাস যাত্রায় ২ ১ বিকল্প চালক রাখতে হবে।
- পাঁচ ঘণ্টা পর পর ১ ২ চালক পরিবর্তন করতে হবে।
- চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট বাঁধা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- চালকদের জন্য মহাসড়কের পাশে বিশ্রামাগার রাখতে হবে।
- চালক ও হেল্পারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- অবশ্যই সিগন্যাল মেনে চলতে হবে।

নিরাপদ সড়ক
নিরাপদ জনজীবন

DFP
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়

DFP
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১৮ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষে জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা ও যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭২তম জন্মদিনে দেশবাসী ও *সচিত্র বাংলাদেশ* পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সময়ের এক সাহসী নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক শুভলগ্নে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেশ ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে তিনি আন্তর্জাতিক পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দেশ ও জাতিকে করেছেন গৌরবান্বিত। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমনা এবং বাংলাদেশের দিশারি।

রোহিঙ্গা সংকট বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। রোহিঙ্গা সমস্যা মানবতার সমস্যা। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, রোহিঙ্গা সমস্যা কাশ্মির কিংবা ফিলিস্তিন সমস্যার চেয়েও করুণ। তারা রাখাইন প্রদেশের অধিবাসী। তারা অভিবাসী নয়। এ নিয়ে এবারের আয়োজনে রয়েছে একটি প্রবন্ধ।

সুদূর অতীত থেকে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের ছিল অপার সম্ভাবনা। সম্ভাবনার দরজা খুলে যায় ১৯৭২ সালে পর্যটন শিল্প কর্পোরেশন গঠনের মধ্য দিয়ে। এই মহৎ কাজটি করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

মেঘ ভারাক্রান্ত বর্ষার পরেই শরতের আগমন। শরৎ ও কাশফুল একসূত্রে গাঁথা। প্রকৃতিতে যখন শরৎ আসে তখন কাশফুলই জানিয়ে দেয় শরতের আগমন বার্তা। এ নিয়ে রয়েছে বিশেষ প্রবন্ধ।

৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস। পৃথিবীর সব মানুষকে নিজেদের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মূলত এই দিনটির প্রচলন হয়েছে। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। এ নিয়ে এবারের সংখ্যায় রয়েছে একটি নিবন্ধ।

এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন সাফল্য ও অর্জন নিয়ে সাজানো হয়েছে নিয়মিত বিভাগ।

সচিত্র বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংখ্যাটি আশা করি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

ব্যাক কভার পেজ অলংকরণ
এইচ কে বর্মণ

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক), ৯৩৩২১২৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

বিশ্বনন্দিত মনীষার সাফল্যগাথা ৪
শাফিকুর রাহী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

জনকের হাচু এখন জগৎ-বিস্ময় ৯
নজরুল ইসলাম

দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বে অনন্য উচ্চতায় শেখ হাসিনা ১১
মাহবুব রেজা

রোহিঙ্গারা নিজ বাসভূমে পরবাসী ১৩
সুফিয়া বেগম

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন ১৯
শামস সাইদ

উন্নয়নশীল বলয়ে বাংলাদেশ ২৫
মো. আজগর আলী

হারিয়ে যাওয়া মনীষা
মহম্মদ এছহাক: জীবন ও সাহিত্য ২৭
ড. মোহাম্মদ হাননান

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও আমাদের করণীয় ৩১
একরাম উদ্দীন সুমন

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প: সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত ৩২
সুহৃদ সরকার

শরৎ ও কাশফুল: দুজন দুজনার ৩৪
সুলতানা বেগম

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা ৩৫
নাজনীন সুলতানা নীতি

গল্প

পৌষপাবনের মেলা ৩৯
মিলন বনিক

হাইলাইটস

কবিতাগুচ্ছ ২৪, ৩৮, ৪৩

জাকির আবু জাফর, কাজী সুফিয়া আখতার খান চমন-ই-এলাহি, মিলি হক, সাদিয়া সুলতানা বাবুল তালুকদার, শাহনাজ, তাহমিনা বেগম ম. মীজানুর রহমান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪

প্রধানমন্ত্রী ৪৫

তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৭

জাতীয় ঘটনা ৪৯

আন্তর্জাতিক ৫০

উন্নয়ন ৫১

ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১

শিল্প-বাণিজ্য ৫২

শিক্ষা ৫৩

কৃষি ৫৪

নারী ৫৫

পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬

সামাজিক নিরাপত্তা ৫৭

নিরাপদ সড়ক ৫৮

যোগাযোগ ৫৮

মাদক প্রতিরোধ ৫৯

স্বাস্থ্যকথা ৫৯

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১

সংস্কৃতি ৬১

চলচ্চিত্র ৬২

ক্রীড়া ৬৩

বিশ্বজুড়ে সেপ্টেম্বর: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

বিশ্বনন্দিত মনীষার সাফল্যগাথা

বর্তমান বিশ্বে সরকার-প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানদের শ্রেষ্ঠতম সম্মানজনক স্থান অর্জনকারী বিশ্বনেতা ও রাষ্ট্রনায়ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বর্তমানে তাঁর মতো দূরদর্শী ও দুঃসাহসী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানবিক নেতা সত্যিকার অর্থেই বিরল। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা আর প্রজ্ঞায় মহীয়সী মনীষা আশাহত জাতির মনোমাঠে বপন করেন বাঙালির হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠার সাহস। তিনি বাঙালি জাতির ভয়ংকর কালবেলায় অতি দৃঢ়তার সাথে দুর্দান্ত মনোবলে সাম্য-সম্প্রীতি আর মুক্তির লড়াইয়ে বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪

রোহিঙ্গারা নিজ বাসভূমে পরবাসী

রোহিঙ্গা সংকট বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়, রোহিঙ্গা সমস্যা মানবতার সমস্যা। একটি মানবগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন (ethnic cleansing) করার সমস্যা। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, রোহিঙ্গা সমস্যা কাশ্মির সমস্যা কিংবা ফিলিস্তিন সমস্যার চেয়েও করুণ। তারা রাখাইন প্রদেশের অধিবাসী। তারা অভিবাসী নয়। রোহিঙ্গারা পূর্বপুরুষ থেকে মুসলমান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মিয়ানমারের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে তারা অংশ নিয়েছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা কখনো অস্ত্র হাতে বিদ্রোহ করেনি। কোনো সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটায়নি। রোহিঙ্গা মুসলমানরা নিতান্তই নিরীহ জনগোষ্ঠী। তারা শান্তিকামী। তারা চান নাগরিক অধিকার এবং মিয়ানমারের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো মাথা উঁচু করে বাস করতে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিয়ানমারে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নাগরিক অধিকার পায়নি– এটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। এ বিষয়ে নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-১৩

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিজস্ব বাণিজ্যিক বিপণনের উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে সংস্থাটি নিজস্ব বিপণন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড' নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১লা নভেম্বর ২০১১ হতে। এ বিষয়ে নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৩২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

প্রবন্ধ

বিশ্বনন্দিত মনীষার সাফল্যগাথা

শাফিকুর রাহী

বর্তমান বিশ্বে সরকার-প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানদের শ্রেষ্ঠতম সম্মানজনক স্থান অর্জনকারী বিশ্বনেতা, রাষ্ট্রনায়ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বর্তমানে তাঁর মতো দূরদর্শী, দুঃসাহসী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানবিক নেতা সত্যিকার অর্থেই বিরল। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা আর প্রজ্ঞায় মহীয়সী মনীষা আশাহত জাতির মনোমাঠে বপন করেন বাঙালির হারানো

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ান ফেডারেশনের উপ-প্রধানমন্ত্রী Yury Ivanovich Borisov ১৪ই জুলাই ২০১৮ পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

অধিকার প্রতিষ্ঠার সাহস। তিনি বাঙালি জাতির ভয়ংকর কালবেলায় অতি দৃঢ়তার সাথে দুর্দান্ত মনোবলে সাম্য-সম্প্রীতি আর মুক্তির লড়াইয়ে বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অঙ্গীকার ঘোষণা করেন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভিযানে। দেশে দেশে, যুগে যুগে অনেক জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধপ্রাণ পরম দেশপ্রেমী নেতার জন্মের মাধ্যমে বিশ্ব মানবসভ্যতা হয়েছে বিকশিত, আরো আলোকোজ্জ্বল।

বিশ্বে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে মানবতা, ধ্বংস আর প্রাণঘাতী আঘাতে বিপন্ন হচ্ছে বিশ্ব লোকালয়। এ দানবীয় আগ্রাসন ও অরাজকতা চলতে দেওয়া যায় না। এসব অন্যায়-অবিচার, মানুষ হত্যা আর ধ্বংসাত্মক অপকর্মের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রাণের নেত্রী শেখ হাসিনা সব সময় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। বিশ্বমানবতার কল্যাণে তিনি নিজেকে করেছেন উৎসর্গ। তিনি প্রিয় স্বজন হারানোর দীর্ঘ শোক-দুঃখের আঁধার সড়ক ভেঙে সমগ্র দেশবাসীকে জানান দিলেন শোককে শক্তিতে পরিণত করে ন্যায়নীতি আর সত্য প্রতিষ্ঠার অহিংস আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণের। তাবৎ বিশ্বজুড়ে দুটি বিষয়কে নিয়ে তুমুল হানাহানি, রক্তপাত আর প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতে হয় ধনী-গরিব কিংবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের মাঝেও। এমনটা চলে আসছে আদিকাল থেকে।

একটি সত্য আর মিথ্যার লড়াই, অন্যটি শুভ আর অশুভের। সভ্যতার শিকড় থেকেই এ নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ চলে আসছে নানা কায়দায়। বর্তমান পরিবর্তন, পরিবর্ধনশীল আধুনিক সভ্য দুনিয়াতেও এর অদলবদল হয়নি। কিছু যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের ফলে তার নিয়মকানুন খানিকটা পালটিয়েছে মাত্র। ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, অশুভ দানবীয় অপশক্তি পরাজিত হয় শুভবাদের মানবিক মহান আদর্শের কাছে। সত্যের জয় অনিবার্য– এটাও পৃথিবীর শুরু থেকে লক্ষ করা যায়। আমাদের প্রিয় নেত্রীও মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয়গান গাইতে গিয়ে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। অশুভর বিরুদ্ধে শুভবাদের নিশান হাতে লড়তে গিয়েও বার বার রক্তাক্ত হয়েছে পবিত্র জমিন। তিনি তাতেও থেমে থাকেননি, তাঁকে কোনো ষড়যন্ত্রকারী ও অপশক্তি দমাতে পারেনি।

তিনি পথ চলেন আপন টানে, আপন আলোয়, সত্য ও সুন্দরের দারুণ প্রত্যাশায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার সাহসী সংগ্রামে। ইতিহাস বিকৃতকারীদের সমস্ত চক্রান্তকে ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলে তিনি বাঙালির অমর সংগীতের সুর মূর্ছনায় নিজেকে খোঁজেন পরম মমতায় ভালোবাসার সুনিবিড় আলো আঁধারের মাঝে ধ্যানরত তপস্যায় ছবি হাতে। আজও যেভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গি সন্ত্রাসীরা রক্তাক্ত করে চলেছে মানুষের মানচিত্র তা কি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায়? ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ আরো অনেক রাষ্ট্রের গৃহহারা লাখো লাখো শরণার্থী অসহায় নারী-শিশুর কান্নায় সমুদ্রের ঊর্মিমালা যেন থমকে দাঁড়ায়, বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এ ধ্বংসলীলার ভয়ংকর থাবা থেকে নিরস্ত্র-নিরীহপ্রাণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য সকল সচেতন ও বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আর বন্ধ করতে হবে অস্ত্র বেচাকেনার হাটবাজার।

মানবসৃষ্ট পরিবেশ প্রতিকূলতা আর প্রাকৃতিক বায়ুদূষণের ফলে গণমানুষের জীবন আজ ভয়াবহ হুমকির মুখে। জলবায়ু দূষণের ভয়ংকর থাবা থেকে মানুষের পরিত্রাণের বিপ্লবী আহ্বান জানিয়েছিলেন বিশ্বের সকল মানুষের জনদরদি নেতা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। ২০১২ সালে জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করে বিশ্বনেতাদের বিস্মিত করেছিলেন। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব মানবসভ্যতা মহাবিপদের সম্মুখীন। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আইলা-সিডরের প্রাণঘাতী ধ্বংসতাণ্ডব মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার যুগোপযোগী বলিষ্ঠ নেতৃত্বে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ার্ত আক্রমণ থেকে মানবসম্পদ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাতে বিশ্বের প্রায় সব দেশের নেতাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন।

এক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পরিবেশ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর আগেও তিনি বিভিন্ন সময় নানামুখী মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় অনেক মূল্যবান পুরস্কার অর্জন করেছেন। আজকে সারা দুনিয়াজুড়ে বঙ্গবন্ধু-কন্যা যে সফল রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার-প্রধানের শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম অর্জন করছেন তা কেবল বাংলাদেশের মানুষের গর্ব নয়, তা এখন বিশ্বগর্বে পরিণত হয়েছে।

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেশরত্ন শেখ হাসিনা দীর্ঘকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এ দুঃসাহসী কর্মপরিচালনা করতে গিয়ে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন– সুন্দর আলোকিত পৃথিবী গড়তে চাই। কিন্তু এর আগে চাই অশুভ জঙ্গিবাদের বিনাশ। তিনি স্বকণ্ঠে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে বলেছেন, 'প্রয়োজনে জাতির পিতার মতো জীবন দেব, তবু আমি কোনো অন্যায়ের কাছে মাতা নত করব না কখনো'।

বর্তমান বিশ্বনেতাদের মধ্যে তিনিই কেবল বার বার এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন– 'জন্মিলে মরতে হয়, তাই আমি কখনো মৃত্যুর পরোয়া করি না। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনে জীবন বাজি রাখতেও আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন যে, আমার পিতা বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য, ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কী ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় বছরের পর বছর কারাগারের ভেতর দুঃসহ জীবন কাটিয়েছেন। আমিও জাতির পিতার সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। এমন তেজোদৃপ্ত উচ্চারণ তিনিই তো কেবল করতে পারেন, যার আছে মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, মমত্ববোধ। মানবপ্রেম আর দেশপ্রেম না থাকলে কোনো নেতাই এমন দুঃসাহসী কণ্ঠে আত্মত্যাগের কথা ঘোষণা করতে পারেন না।

এযাবৎকালে তিনি অর্জন করেছেন যেসব গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বা সম্মাননা–ডিলিট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে, জাপানের ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি থেকে অনারারি 'ডক্টর অব ল' ৪ঠা জুলাই ১৯৯৭ সালে, স্কটল্যান্ডের ডান্ডির ইউনিভার্সিটি অব এবারেটে থেকে 'লিবারেল আর্টস'-অনারারি পিএইচডি ২৫শে অক্টোবর ১৯৯৭ সালে, ১৯৯৭ সালে ভারতের 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র পদক', ১৯৯৭ সালে রোটারি ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'পল হ্যারিস ফেলো'। পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কোর 'ফেলিক্স হুফওয়ে বইনি শান্তি পদক', সর্বভারতীয় শান্তি পরিষদের 'মাদার তেরেসা পদক ১৯৯৮', বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র প্রসারে অবদানের জন্য নরওয়ের অসলোর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'এম কে গান্ধী পদক'। ১৯৯৮ সালে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের 'মেডেল অব ডিস্টিংশন ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৮-৯৯', 'হেড অব স্টেট মেডেল ১৯৯৬-৯৭', ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডিগ্রি 'দেশিকোত্তম', 'ডক্টর অব লিটারেচার' ২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৯, ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও)-এর 'সেরেস মেডেল ১৯৯৯', অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 'ডক্টর অব ল' ২০শে অক্টোবর ১৯৯৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি 'ডক্টর অব ল' ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৯, ২০০০ সালে আফ্রো-এশিয়ান লইয়ার্স ফেডারেশনের 'পার্সন অব দ্য ইয়ার', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাট অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ব্রিজপোর্ট থেকে অনারারি 'ডক্টর অব হিউম্যান লেটাস' ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০০, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য অর্জন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার র‍্যানডল্ফ ম্যাকন ওম্যান'স কলেজ থেকে 'পার্ল এস বাক পদক' ৯ই এপ্রিল ২০০০ সালে।

এছাড়া আরো পেয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব লায়ন্স ক্লাবের 'মেডাল অব মেরিট পদক-২০০৫', ২০০৯ সালে ভারত সরকারের 'ইন্দিরা গান্ধী পদক', শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের 'এমডিজি পদক-২০১০', ২০১১ সালে গণতন্ত্র সুসংহতকরণে প্রচেষ্টা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য ফ্রান্সের দোফিয়োঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, ২০১১ সালে বিশ্ব মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদানের জন্য জাতিসংঘ ইকনোমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, জাতিসংঘে এন্টিগুয়া-বারমুডার স্থায়ী মিশন, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন ও সাউথ-সাউথ নিউজের 'সাউথ-সাউথ পদক', 'বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ ২০১১', ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' জানুয়ারি ২০১২, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কোর 'কালচারাল ডাইভারসিটি পদক' লাভ করেন ২০১২ সালে।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর 'পিস ট্রি' পুরস্কার, জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নেতৃত্বের জন্য জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) 'আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ লাভ করেন। আমাদের মহান নেত্রীর এই বিশ্বজনীন সম্মান অর্জনে একজন কবি হিসেবে বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে আলোকিত ও আন্দোলিত করে। এমন অনেক পুরস্কার আছে যা পেলে একজন সৃজনশীল মানুষের কর্মস্পৃহা যেমন বেড়ে যায় তার প্রতিভা বিকাশেও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এ যাবৎকালে যে সকল মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তা বিশ্বের অন্য কোনো নেতার ভাগ্যললাটে অঙ্কিত হয়েছে কি-না তা আমার জানা নেই।

সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের প্রাচীন প্রাচীর ভেঙে ভয়ংকর অন্ধকারে আলোর পরশে আনন্দবানে তিনি ভাসিয়েছেন হাজার হাজার ছিটমহলবাসীকে। কঠিন বাধার আঁধার পথ অতিক্রম করে আলোর জগতে প্রবেশ করবে–ছিটবাসী কি তা কখনো ভেবেছিল? তাদের অন্ধকার জীবন এমন অপরিসীম আলোর ফোয়ারায় উদ্ভাসিত হবে! দীর্ঘকাল ধরে অলীক অভিশাপের অনলে জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছিল তাদের তাপিত মনোলোক। আজ তারা আলোর মিছিলে বাধভাঙা আনন্দে উদ্বেল। আবেগে-আনন্দ অশ্রুতে মুখরিত আজ দশদিগন্ত। তারা এখন আলোকিত আগামীর স্বপ্ন দেখে, তাদের আগামী প্রজন্ম স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। দীর্ঘ জনম পর 'মুজিব-ইন্দিরা' চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়নের পথে আর কোনো বাধা থাকল না। আজ তারা সকলেই স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক। প্রধানমন্ত্রীর প্রবল প্রজ্ঞা আর দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার ফলে মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে দীর্ঘকালের অমীমাংসিত ইস্যু–সমুদ্রসীমার সফল সমাধানের এক অপরিসীম কর্মসাধনের ভেতর দিয়ে অবর্ণনীয় অপরিসীম সাফল্য অর্জন করে। এরফলে বাঙালি জাতির আর এক বিরল সৌভাগ্যের অমর ইতিহাস রচিত হলো। যা অন্য কোনো সরকার-প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানরা চিন্তাও করেননি।

একটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশ বাংলাদেশে আজ উন্নয়নের যে সুবাতাস বইছে তা দেখে সকলেই বিস্মিত, কারণ বর্তমান বিশ্বে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যেভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছেন, খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলেছেন অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে তা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি-না জানি না।

এ সাফল্যগাথা অর্জনের পেছনে জড়িয়ে রয়েছে এদেশের অসংখ্য মেহনতি কৃষক, শ্রমিকের অমূল্য অবদান। আজ বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানিকারক দেশের গৌরব অর্জন করেছে, যা সম্ভব হয়েছে একমাত্র কৃষিবান্ধব শেখ হাসিনার সুদৃঢ় পদক্ষেপের কারণে। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে।

যে মহান নেতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ করেছিল আত্মদান, সেই মহান নেতা জাতির পিতাকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তিযুদ্ধের সে পবিত্র স্লোগান 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ। যা ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়। সেই ভয়াবহ দানবীয় দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে জীবন বাজি রেখে মাটি ও মানুষের দুশমনদের হটিয়ে দিয়ে গণমানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা।

তিনি বিশ্বমানবতার মুক্তির দুঃসাহসিক সকল কর্মকাণ্ডে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন সে অসামান্য সাফল্যগাথার স্বীকৃতি কি তিনি পাবেন না? অনেক আগেই তিনি সেই যোগ্য সম্মান পাওয়ার সময় অতিক্রম করেছেন তাঁর বিশ্বশান্তির নানাবিধ গৌরবান্বিত কল্যাণীয় কর্মযজ্ঞের অমর ইতিহাস রচনার মাধ্যমে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এক জনগুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের সোনালি স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনিইতো পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের চির অবসান ঘটিয়ে শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে পাহাড়ে চিরস্থায়ী শান্তি কায়েম করেছেন।

আজ সারা বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় জঙ্গি-সন্ত্রাসী অপকর্মের ফলে লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা হয়ে পড়ছে হুমকির সম্মুখীন। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জঙ্গি-সন্ত্রাসী নির্মূলসহ ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন অতীব বিচক্ষণতা ও সাহসের সাথে। এদিক বিবেচনায় সম্মানজনক নোবেল পুরস্কারটি আগামীতে দেশরত্ন শেখ হাসিনা পেতেই পারেন। তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নোবেল থেকেও অনেক বড়ো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যা হাজার নোবেলের চেয়েও অনেক উত্তম এবং গৌরবের। তাহলো বাংলার কোটি কোটি মানুষের পরম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তিনি আজ বিশ্বনেতা ও রাষ্ট্রনায়কের অভিধায় আলোকিত করে চলেছেন দশদিগন্ত।

তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞায় বিশ্বনেতা হিসেবে যে খ্যাতির গোলাপ কুড়িয়েছেন তাও কি নোবেলের চেয়ে কম মূল্যের? তারপরও আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনন্দিত জনদরদি নেতা গণমানুষের পরম আপনজন দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে নোবেল কমিটি যেন তাদের মহামূল্যবান পুরস্কারটি প্রদান করে বাঙালির আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করে। তাঁকে যেসব বিষয়ের ওপর নোবেল পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে–

১. ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি করে দীর্ঘ দু'দশকেরও অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে জানান দিয়েছিলেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাসীদের স্থান নেই। এই দূরদর্শী ও বীরত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের একমাত্র যোগ্য দাবিদার তিনি।

২. তাঁর অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের মানুষ আজ ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চলেছে। এ জনগুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের অকল্পনীয় ভূমিকার জন্যও নোবেল প্রাইজটি পেতে পারেন কেবলমাত্র শেখ হাসিনা। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বে আর কোনো দেশ এমনিভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।

৩. প্রধানমন্ত্রী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুপ্তঘাতক জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের ভয়ংকর আগ্রাসনকে অত্যন্ত সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বিধায় সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এসব জনগুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের জন্যও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য দাবিদার দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

৪. দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা বিরোধ। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সেই বিরোধ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে বহির্বিশ্বে তুমুল প্রশংসা ও আলোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা।

৫. হাজার হাজার ছিটমহলবাসীদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ইস্যুকে সফল সমাধানের এক অসাধারণ অবদানের মধ্য দিয়ে তিনি বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখার পুনঃবাস্তবায়নের ফলে দুদেশের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির নতুন সেতুবন্ধনে মানবিকতার শুভ যাত্রাপথ সৃষ্টি করেছেন। যা অতি বীরত্বপূর্ণ ও গর্বিত জাতি হিসেবে আজ ছিটের গণমানুষেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ লাভ করেছে। এমন আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের জন্য বিশ্বনেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার একমাত্র দাবিদার।

এর আগে তিনি দেশ-বিদেশে আরো অনেক পুরস্কার পেয়েছেন মানবতার কল্যাণে নানামুখী কর্মসাধনের অমূল্য অবদানের জন্য। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু-স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নয়ন, ক্ষুধাপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আজ তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন, যা বিশ্বে কোনো দেশ পারেনি। কেবলমাত্র বাংলাদেশ পেরেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও গতিশীল নেতৃত্বের ফলে।

তাঁর সৃজন সাধনায় এযাবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ২ ডজনের অধিক। যা তাঁর মননশীল চিন্তা-চেতনায় রচিত, যাতে স্থান পেয়েছে অধিকারহারা গণমানুষের কথামালা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ–*স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র*, *ওরা টোকাই কেন*, *বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা*, *সহেনা মানবতার অবমাননা*, *সাদাকালো*, *বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন*, *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তা-ভাবনা*, *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*, *অপ্রকাশিত রচনা*, *সবুজ মাঠ পেরিয়ে* ইত্যাদি। এমন অসাধারণ গ্রন্থের লেখক আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সেসব রচনায় উঠে এসেছে বীর বাঙালির স্বপ্ন ও সফলতার গর্বগাথা।

দেশরত্নের এসব গ্রন্থ আমাদের সকলের পাঠ করা দরকার। এসব গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা তাঁকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব, চিনতে ও জানতে পারব আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উদার নীতি ও মানবিকতার মর্মগাথা।

তাঁর ডিজিটাল বাংলাদেশের অতুলনীয় আলোকোজ্জ্বল দর্শনের ফলে আজ বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে ভাগ্য পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বাধার সকল দুর্গম পথকে অতিক্রম করে আজ বিশ্বদরবারে বাঙালি জাতি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে, সারাবিশ্বে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও দেশের জন্য, দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্বমানবতার মহামুক্তির লক্ষ্যে দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের রায় ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশে আইনের শাসন কায়েম করেছেন। একাত্তরের পরাজিত খুনি ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছেন, যা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জিং ও দুঃসাহসিক কাজ। সে বিচারের রায়ও একে একে কার্যকর হচ্ছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

মুজিব বর্ষ ২০২০-২১

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী

খালেক বিন জয়েনউদদীন

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ৬ই জুলাই ২০১৮ তারিখ বিকালে আওয়ামী লীগের নবনির্মিত ১০তলা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ সভায় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতার জন্ম বছর এবং ২০২১ সাল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর। তাই ২০২০-২১ সালকে আমরা 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে পালন করব।

সভায় তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'জীবন দিয়ে হলেও আপনাদের ঋণ আমি শোধ করে যাব'। সপরিবার জীবন দিয়ে তিনি আমাদের ঋণী করে গেছেন। সেই ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করতে হবে। তাই আমরা তাঁর জন্মবছরব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জাঁকজমকভাবে 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বছর' উদ্‌যাপন করব। তিনি আরো বলেন, ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্মদিন থেকে এ বছর শুরু হয়ে শেষ হবে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে। এ সময়ের মধ্যে জন্মদিনের কর্মসূচির সাথে বিশেষভাবে পালন করা হবে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, ৭ই জুন ছয় দফা দিবস, শোকাবহ ১৫ই আগস্ট, ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস এবং বিশেষভাবে ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্মদিন।

ইতোমধ্যে বছরব্যাপী মুজিব বর্ষ পালনের জন্য জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে প্রধান করে একটি উচ্চ নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব কবি কামাল চৌধুরী। আর আওয়ামী লীগের কর্মসূচি পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চেয়ারম্যান ও দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে মুজিব বর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ে এলক্ষ্যে অনেক উপ-কমিটি গঠন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুজিব বর্ষ পালনের এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি বাঙালির জনগণের প্রাণে আশার সঞ্চার করেছে। এমনিতেই সারাবিশ্বে তথা আমাদের উপমহাদেশে জন্মশতবর্ষ পালনের একটি রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রাণের মানুষ। এ অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন। পঞ্চান্ন বছর জীবনের ১৪টি বছর তিনি পাকিস্তানি কারাগারে কাটিয়েছেন। তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল আজকের বাংলাদেশ। তিনি ছিলেন আপোশহীন সংগ্রামী ও বিপ্লবী নেতা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাঁর অবদান বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্বের যে কজন বিপ্লবী নেতা সর্বহারা ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন তারমধ্যে অন্যতম। তাঁর কর্মক্ষেত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হলেও বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর দরদ ছিল অসীম। আমরা অনেকেই জানি না এই মহানায়ককে ১৯৭৩ সালের ২রা মে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্য বিশ্ব শান্তি পরিষদ জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করে। উল্লেখ্য, ঐ বছর নোবেল কমিটি নোবেল শান্তি পুরস্কার স্থগিত রাখে। বিশ্বের অন্যতম বেতার প্রচারণী সংস্থা বিবিসি বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে ঘোষণা দেয়। আজও তিনি বিশ্বের অসহায় ও স্বাধীনতাকামী মানুষের একটি আদর্শ এবং সংগ্রামের উজ্জ্বল মূর্ত প্রতীক। আমরা তাঁর সংগ্রাম ও স্বাধীনতার বিশ্বাসে শরিক হওয়ার কারণেই তাঁর হিমালয়সম অবদানের মূল্যায়নে অপারগ থেকেছি। জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবনালেখ্য আমাদের চিন্তা- চেতনায় নতুন করে দুয়ার খুলে দেয়। আমরা যে পাপ করেছি, তার দায় থেকে মুক্তি পাই না। তাঁর কথা ভাবতে গেলে কল্পনাশক্তি বিলুপ্ত হতে চায়, লিখতে গেলে ভাষার বিশেষণ খুঁজে পাই না। কখনো শোকে-দুঃখে মুষড়ে পড়ি। আবার শত বছরের কালক্রমে তাঁর ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা দেখে গৌরববোধ করি। তিনি বাঙালির মুক্তির মহানায়ক ও সর্বকালের সংগ্রামী আদর্শ।

শেখ মুজিব উপমহাদেশ এবং বিশ্বের গান্ধী, সুভাষ, নেহেরু, জিন্নাহ, মার্কস, লেলিন, স্টালিন, মাও সেতুং, সুকর্ণ, কামাল আতাতুর্ক, ম্যান্ডেলা, ক্যাস্ত্রো, হোচি মিন, মার্টিন লুথার কিং কিংবা জর্জ ওয়াশিংটন কারো সাথেই তুল্য নন। তাঁদের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শৃঙ্খলমুক্তির প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। তাঁদের সংগ্রামী জীবনের অভিযাত্রার সাথে বঙ্গবন্ধুর মহান ত্যাগের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই মহাপুরুষদের মহাসরণিতে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান সমান্তরাল ও অনড়। তাই এক শতাব্দী নয়, শত শতাব্দীতেও বঙ্গবন্ধু নির্যাতিত-নিপীড়িত ও স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী পালন তাই বাঙালির কাছে গৌরবের বিষয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্মরণ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কারণ আমরা তাঁর স্বপ্নের মুক্ত মাটিতে বেঁচে আছি। শত ষড়যন্ত্র, কষ্ট, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ, দুর্বিপাক ও সংকোচের মধ্যে তাঁরই চেতনায় আমরা আত্মনির্ভরশীল। তাই জন্মশতবার্ষিকী আমাদের তাঁর ঋণ পরিশোধের এবং পাপ মোচনের মাহেন্দ্রক্ষণ এনে দিয়েছে। শুধু সরকারিভাবেই নয়, ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে বেসরকারিভাবে মুজিব বর্ষ পালন আবশ্যক। কারণ মুজিব সকল বাঙালির, সকল মানুষের এবং সকল যুগের।

বছরব্যাপী তাঁর স্মরণ চাট্টিখানি কথা নয়। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জন্মবর্ষের কর্মসূচি প্রণয়ন করা আবশ্যক। জাতীয় নাগরিক কমিটি ও আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি সকল স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের এলক্ষ্যে এগিয়ে আসা আবশ্যক।

উপজেলা, জেলা এবং প্রধান প্রধান শহরে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠন। এসব সংগঠন ও সংস্থা কর্মসূচি প্রণয়ন করলে জন্মশত বছরের স্বপ্ন সফল হবে। এ কর্মসূচি পালনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় এখনই জন্মশত-বার্ষিকীর কর্মসূচি প্রণয়ন করা এবং এলক্ষ্যে সরকারের সহযোগিতামূলক নির্দেশাবলি এখনই জারি করা দরকার। আঠারো সাল যায় যায়। উনিশ সালটি আমাদের সময়। এ সময়ের মধ্যে বিশ-একুশের সকল কর্মসূচি প্রণয়ন করা দরকার। আমাদের পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনের অভাব নেই। অনেকেই নানা অজুহাত দেখিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে জন্মবার্ষিকীর আয়োজন সীমাবদ্ধ রেখে মুজিব বর্ষ পালন সমাপ্তি করতে চাইবেন। তাই এ রকমটি যাতে না হয়, তারজন্য বঙ্গবন্ধুপ্রেমী হিসেবে কতগুলো অনুরোধ রাখছি। এগুলো প্রস্তাবও বলা যায়। বিবেচনা করবেন কর্তৃপক্ষ। আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, তেমনি তাঁরই জন্মশতবর্ষ পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেছি এই শতকে। তাই আমাদের সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে একাত্তরের চেতনায় জন্মশতবর্ষের সকল অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে।

প্রস্তাবসমূহ

- নাগরিক কমিটি, দলীয় কমিটির পাশাপাশি একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মহিলা সমিতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিশু একাডেমি, জাতীয় মহিলা সংস্থা, নজরুল ইনস্টিটিউট সমন্বয়ে কমিটি গঠনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সমন্বয়ে আর একটি কমিটি গঠন হতে পারে।
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, এফডিসি, পিআইবিসহ সকল সরকারি-বেসরকারি দৈনিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের নিয়ে আর একটি কমিটি গঠন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের সমন্বয়ে আরো একটি আলাদা কমিটি গঠন।

এসব কমিটিসমূহ সরকারি আয়োজনের পাশাপাশি বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রণয়ন করবে। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার, সেমিনার, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, পত্রিকাসমূহের বিশেষ সংখ্যা, ক্রোড়পত্র এবং একটি করে জন্মশত বছরের বার্ষিকী গ্রন্থ প্রকাশ করবে। প্রকাশ্যে ও মিলনায়তনে বাঙালি সংস্কৃতি তথা লোকজ সংস্কৃতির গান, যাত্রা-পালা, রয়ানি, রামায়ণ, পুঁথিপাঠ, জারি-সারি, গম্ভীরা, কবিগান, গাজীর গীত ও লালন-হাছন রাজার গান আয়োজনের দায়িত্ব সাংস্কৃতিক জোটকে দেওয়া যেতে পারে। আর বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা পাঠ আয়োজন করবে জাতীয় কবিতা পরিষদ ও ছড়া সাহিত্য পরিষদ।

সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধু বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং তাদের মধ্যে বছরের শুরুতে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে গ্রন্থ ক্রয় ও বিতরণ। গ্রন্থ ক্রয় ও বিতরণের দায়িত্বটি পালনের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। সকল প্রচারমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী, রোচনামচা, ভাষণ ও লেখকদের রচিত বঙ্গবন্ধু বিষয়ক সাহিত্যকর্ম প্রচার করা। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি ও সমাধিস্থল টুঙ্গিপাড়া, ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বরে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাড়িটির জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও কেন্দ্রীয় শহিদমিনার বিনামূল্যে সরকারি পরিবহণে প্রদর্শন করা।

এসব কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে পরিচালিত করার জন্য আয়োজনকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হবে সরকারকে। এজন্য উক্ত বছরের জাতীয় বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখতে হবে। পাশাপাশি বিদেশে আমাদের মিশনসমূহকে জন্মশতবার্ষিকী পালনের নির্দেশনামা জারি করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না এ জীবনে আমাদের বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বছর একবারই হবে।

জন্মশত বছরের সকল আয়োজনে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বঙ্গবন্ধু কী স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সংগ্রামী জীবনে। তাঁর জীবনের প্রথম বিপ্লব বা সংগ্রাম সফল হয়েছিল। দ্বিতীয় বিপ্লব সফল হয়নি কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে। তারা হানা দিয়েছিল বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের চার খুঁটির ভেতরে। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। যার জন্মদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জন্মের আবহে জড়িয়ে আছে টুঙ্গিপাড়া তথা গ্রামবাংলার হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির জীবনাচরণই ধারণ করেছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু। তাই তাঁকে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আত্মদানকারী বরপুত্রদের মুজিব বর্ষে স্মরণ করতে হবে যথাযোগ্য মর্যাদায়। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, একাত্তরের শত্রুরা এখনো সমূলে নিপাত যায়নি। তাদের চেলা-চামুণ্ডেরা ঘরে এবং বাইরে লুকিয়ে আছে কুনো ব্যাঙের মতো। আসুন, আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে বঙ্গবন্ধুর ঋণ স্বীকারে আত্মনিবেদন করি এবং মুজিব বর্ষ পালনে অংশ নেই।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

৭২তম শুভ জন্মদিন

জনকের হাচু এখন জগৎ-বিস্ময়

নজরুল ইসলাম

বাবা শেখ মুজিব আদর করে বাড়ির বড়ো সন্তানকে ডাকতেন কখনো 'হাচু' বলে, আবার কখনো 'হাচিনা'। শুদ্ধ করে ডাকলে হতো 'হাসিনা'। আবহমান বাংলার মা-বাবারা সন্তানদের আদর করে ডাকতে অভ্যস্ত। তাই মূল নামটা হয়ে যায় একটু আদুরে। কখনো কখনো মূল নামের সঙ্গে তার মিলও থাকে না। যেমন শেখ মুজিব মা-বাবার কাছে পরিচিত ছিলেন খোকা হিসেবে। সেই শেখ মুজিব একদিন হয়ে গেলেন 'বঙ্গবন্ধু', মানে বাংলার বন্ধু। সেই বঙ্গবন্ধুই একদিন হয়ে উঠলেন 'জাতির পিতা'। সেই জাতির পিতাকে সপরিবার পাকিস্তানিদের বন্ধুরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হত্যা করল। বিদেশে অবস্থানের কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁর দুই কন্যা– হাচু আর রেহানা। সেই হাচু বর্তমানে বাংলাদেশের সফলতম প্রধানমন্ত্রী– বিশ্ব তাঁকে চেনে শেখ হাসিনা নামে।

বিশ্বের সেরা ১০ নারী নেত্রীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তালিকায় তাঁর অবস্থান ষষ্ঠ। বিশ্বখ্যাত সাময়িকী *টাইম অনলাইন* সংস্করণে এ তালিকা প্রকাশ করে। তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড। এর পরের অবস্থান আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জোহানা সিগুরদারদোত্তির। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা ফার্নান্দেজ ডি কির্চনার তৃতীয়। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশের সরকার-প্রধান হিসেবে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পান মর্যাদাপূর্ণ অ্যাসোসিও আইটি অ্যাওয়ার্ড, যার লালিত স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া।

দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তিনি জননেত্রী। তিনি যখন বাংলাদেশের বাইরে তখন তাঁর নাম তেমন একটা কেউ জানতেন না। এখন শুধু জানেন না, তাঁকে সম্মান করেন, কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনেন। নিজেদের বক্তৃতায় তাঁকে উদ্ধৃত করেন। স্বীকার করেন তাঁর হাতে জাদু আছে। বিশ্বে তিনি স্বীকৃত একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। বিশ্বখ্যাত *ফোর্বস ম্যাগাজিন* জরিপ করে বলেছে, শেখ হাসিনা বিশ্বের ৪৭তম ক্ষমতাধর নারী। আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেয়েছেন অনেক। অনেকে মনে করেন, শেখ হাসিনার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এখন সময়ের দাবি। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার না পেলে তেমন কিছু একটা আসে-যায় না। মহাত্মা গান্ধী একাধিকবার এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। পাননি। হিটলারকেও মনোনীত করা হয়েছিল একবার। বিশ্বশান্তিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। তিনি কিন্তু এই পদকে ভূষিত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রথমবার ক্ষমতায় যাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মাথায় নোবেলপ্রাপ্ত হয়েছেন এই প্রত্যাশায়– তাঁর শাসনামলে বিশ্বটা একটু শান্ত হবে। ঠিক উলটোটাই হয়েছিল তাঁর আট বছরের শাসনামলে। রাজনৈতিক নেতা হতে পারাটা অনেক সহজ। রাষ্ট্রনায়ক হতে হলে দূরদৃষ্টি থাকতে হয়। সময়ের দাবিকে সম্মান করে দেশের জন্য ঝুঁকি নিতে হয় কখনো কখনো। শেখ হাসিনা তা অনেকবার নিয়েছেন। দেশের স্বার্থে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। তাঁর কাছ থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। সেই জননেত্রীর এ বছর ২৮শে সেপ্টেম্বর ৭২তম জন্মদিন। এই দিনে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা।

১৯৯৪ সালে জাতীয় শোক দিবসে টুঙ্গিপাড়া গিয়েছিলাম জাতীয় শোক দিবসের এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। মধুমতী নদীর পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ দিয়ে যেতে হয়েছিল। কানায় কানায় পূর্ণ তখন মধুমতী। দুই পাড়ে কাশবন। একটি নদী যে এত সুন্দর হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সেই মধুমতী নদীর অনতিদূরে দেশভাগের এক মাসের মাথায় টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মেছিলেন মা-বাবার আদরের হাচু, হাচিনা আর

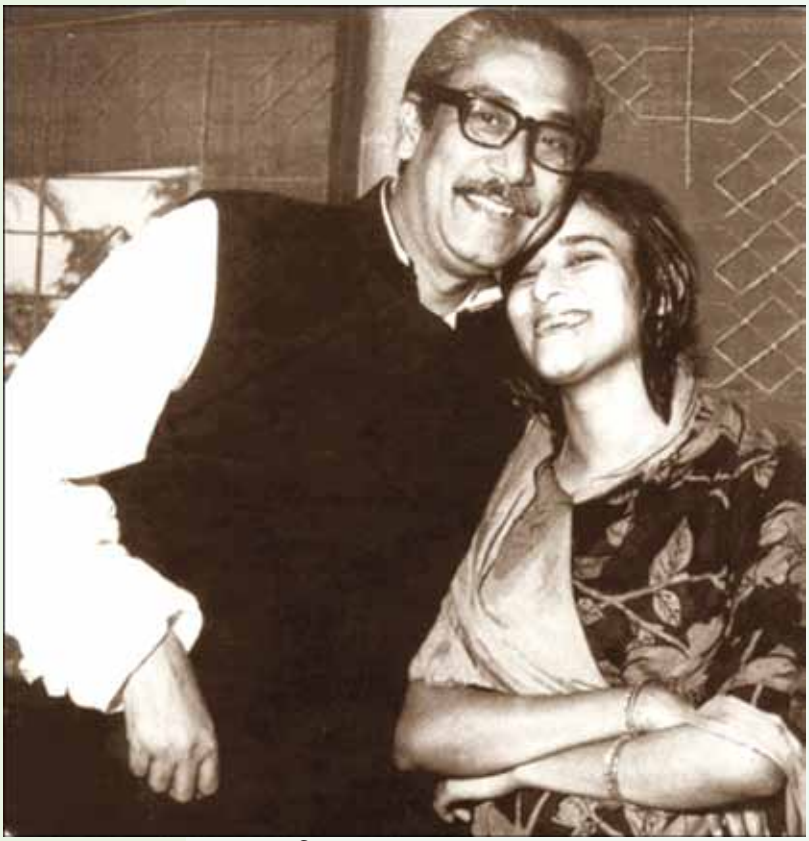

বাবার একান্ত স্নেহে কন্যা শেখ হাসিনা

আজকের শেখ হাসিনা। যারা শেখ হাসিনার কাছে গিয়েছেন তারা স্বীকার করবেন, বঙ্গবন্ধু-কন্যা আক্ষরিক অর্থে কখনো শহুরে হাইফাই মেয়ে হতে পারেননি। শিফন শাড়ি পরিহিত, চোখে দামি সানগ্লাস আর পায়ে বিদেশি হাইহিল পরা একজন শেখ হাসিনাকে কল্পনা করা অসম্ভব। কাছে গেলে মনে হবে তিনি বাড়ির বড়ো বুবু অথবা ছোটো ফুফু। এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এক বালিকা তো তাঁকে দাদি বলেই সম্বোধন করল। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন কবিতা শর্মা। বর্তমানে ড. কবিতা শর্মা, দিল্লির সাউথ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট (উপাচার্য)। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, শেখ হাসিনা সপরিবার তাঁদের প্রতিবেশী হওয়ার অনেক পরে তারা তাদের প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনেছিলেন। তিনি শেখ হাসিনাকে কখনো কখনো বাজারে যেতেও দেখেছেন।

পরিচয় হয়েছিল অনেক পরে। শেখ হাসিনার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। কর্মসূত্রে ড. শর্মার সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমার কাছে জানতে চান, কেমন আছেন তাদের সেই প্রতিবেশী? বলি, তিনি দিনরাত পরিশ্রম করছেন বাবার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য। ড. শর্মা আমাকে জানান, দিল্লিতে থাকতে তিনি শেখ হাসিনাকে প্রায়ই বিষণ্ন দেখলেও তাঁর চোখে-মুখে একধরনের দৃঢ়তার ছাপ লক্ষ করতেন। তাঁকে বলি, বর্তমানে তাঁর সেই দৃঢ়তা শুধু বাড়েইনি বরং তিনি সেই দৃঢ়তাকে দেশের প্রয়োজনে দুঃসাহসে রূপান্তর করতে পিছপা হননি।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনা, তাঁর স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া ও পরিবারকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছিলেন। দেশের সঙ্গে যোগাযোগটা তত সহজ ছিল না। শুধু জানতেন যারা এক রাতেই তাঁর পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল তারাই ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে শাসন করছে। বঙ্গবন্ধু কন্যার দেশে ফেরা নিষিদ্ধ। যে দলের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ হয়েছে। দলের কিছু নেতা যাদের বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, তারা ঘাতকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দল অনেকটা ছত্রভঙ্গ। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজনদের কয়েকজন দলকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর রক্তের কোনো উত্তরাধিকার যদি দলের হাল ধরেন তাহলে কাজটা কিছুটা হলেও সহজ হতে পারে। তেমন উত্তরাধিকার আছে তো মাত্র দুজন। তারমধ্যে ছোটো জন শেখ রেহানা একেবারেই বালিকা। বাকি বড়ো জন, শেখ হাসিনা। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সেই শেখ হাসিনাকেই সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। দলের সিনিয়র নেতারা ছুটলেন দিল্লিতে তাঁদের নতুন সভাপতিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে। ছয় বছর নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে এক বৃষ্টিস্নাত বিকেলে সব হারানো বঙ্গবন্ধু-কন্যা ফিরে আসেন দেশের মাটিতে। সেদিন কত মানুষ তেজগাঁও বিমানবন্দর, ঢাকা শহরের রাস্তায় বঙ্গবন্ধু-কন্যাকে একনজর দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল, তা শুধু অনুমানের বিষয় হতে পারে। সম্পূর্ণ পরিবার হারানো আক্ষরিক অর্থে একজন নিঃস্ব মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে মানসিক ভারসাম্য হারানোটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দেশে ফিরে শেখ হাসিনা তাঁর মনের ভেতরের রক্তক্ষরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁর প্রবাদতুল্য দৃঢ়তার স্বাক্ষর হিসেবে হাল ধরেছিলেন দেশের ঐতিহ্যবাহী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ঘাতকদের সমুচিত জবাব তখনই দেওয়া হবে যখন দলকে পুনর্গঠন করে তাঁকে আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হবে। সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে তা তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই প্রায় অসম্ভব কাজটাকেই শেখ হাসিনা সম্ভব করেছিলেন দল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ২১ বছর পর, যা বিশ্বের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। কেমন ছিল শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পরবর্তী সময়, তা বোঝা যায় তাঁকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত তাঁর পৈতৃক বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়াতেই। বাড়ির সামনের রাস্তায় বসে তাঁকে পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ পড়তে হয়। বঙ্গবন্ধু-কন্যা বিচলিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি।

তাঁর একাগ্রতা, নিরলস পরিশ্রম, আত্মপ্রত্যয় আর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে অন্য কয়েকটি দলের সমন্বয়ে মহাজোট সরকার গঠন করেছিলেন। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু-কন্যার নতুন পথচলা শুরু। আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের মানুষের চাহিদার মাত্রাটা আকাশচুম্বী হয়, যা হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে দলের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়, সেই দলের কাছেই তো মানুষের প্রত্যাশা থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে তিনি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা একজন লড়াকু সেনাপতির মতোই সংসদ ও সংসদের বাইরে শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট তাঁকে গ্রেনেড মেরে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। তাঁর নেতাকর্মীরা নিজেদের জীবন দিয়ে তাদের নেত্রীকে সেদিন রক্ষা করে। নিজের জীবন দিয়ে একটি দলের প্রধানকে রক্ষা করার নজির বিশ্বের ইতিহাসে তেমন একটা নেই।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় অনেকটা অবধারিত ছিল; নির্বাচনে জয়ী হয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তিনি শুধু হাতই দেননি, সেই বিচারের মহামান্য আদালত কর্তৃক দেওয়া রায় বাস্তবায়ন করতেও পিছপা হননি। জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক চাপ ছিল বিচার বন্ধ করার অথবা রায় বাস্তবায়ন না করার। আবারো বঙ্গবন্ধু-কন্যার দৃঢ়তার বিজয় হয়। এবার বঙ্গবন্ধু-কন্যা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তব্যে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে দেওয়া পিতার ভাষণের সূত্র ধরে বলেছিলেন, 'শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সব সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হব'। বিশ্ব সম্প্রদায়কে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিশ্বায়নের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'একই সঙ্গে এদের পরামর্শদাতা, মূল পরিকল্পনাকারী, মদদদাতা, পৃষ্ঠপোষক, অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহকারী ও প্রশিক্ষকদের খুঁজে বের করতে হবে'। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের দিকে যাদের দৃষ্টি আছে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এসব কথা যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় ১০০ ভাগ প্রযোজ্য। তিনি সাহসের সঙ্গে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়েই এই সত্য কথাগুলো অকপটে বলেছেন। এটি একজন শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব। বিশ্বকে বলেছেন জঙ্গিবাদ দমনে তাঁর সরকারের সাফল্যের কথা।

শেখ হাসিনার মানবিক গুণাবলি প্রবাদতুল্য। একবার বিদেশে যাত্রাকালে তাঁর সফরসঙ্গী মহিলা চেম্বারের এক নেত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই সেই নারীর মাথা কোলে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা শুরু করে দেন। কোনো একজন শিল্পী, খেলোয়াড় কিংবা সব্যসাচী লেখক অসুস্থ হলে ছুটে যান তার কাছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার খুলে দেন তাদের চিকিৎসার জন্য। চতুর্থ শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া বালক শীর্ষেন্দু পটুয়াখালী থেকে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখে তাদের গ্রামের পায়রা নদীর ওপর একটা সেতু চেয়ে, কারণ স্কুলে যেতে তাদের কষ্ট হয়। বিদেশে অবস্থান করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীর্ষেন্দুকে চিঠি লিখে জানান, তৈরি করে দেবেন তিনি সেই সেতু। এমন একজন মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? বঙ্গবন্ধু-কন্যা বিয়েশাদি করে সংসার পেতেছিলেন। হয়ত চিন্তা করেছিলেন, ছেলেমেয়ে মানুষ করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে জাতীয় রাজনীতিতে টেনে এনেছে। ১৯৮১ সালের পর তিনি দেশের রাজনীতির ইতিহাসের গতিধারা পালটে দিয়েছেন। হয়ে উঠেছেন ইতিহাসের নন্দিত কন্যা। টুঙ্গিপাড়ার হাচু, হাচিনা, শেখ হাসিনা এখন সারা বিশ্বের একজন স্বীকৃত সফল রাষ্ট্রনায়ক। ইতিহাস-কন্যাকে এই দিনে অভিনন্দন। জয়তু শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধু কন্যা।

লেখক: শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিশ্লেষক, সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাদার অব হিউম্যানিটি

দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বে অনন্য উচ্চতায় শেখ হাসিনা

মাহবুব রেজা

বাংলাদেশের জন্য ধারাবাহিক অগ্রগতি আর সম্মানের পথটি দিন দিন প্রশস্ত করে চলেছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ ও মানুষের উন্নয়নের কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সব সময় যে কথাটি প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেন তাহলো, 'ব্যক্তিগতভাবে এদেশের কাছে আমার কিছুই চাওয়ার নেই। আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজের জীবন বাজি রেখে এদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। '৭৫-এর পনেরোই আগস্টে পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেললে আমি আর আমার বোন সব হারাই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তারা দেশ থেকে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠায় আর দেশের মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এরপর থেকে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশে ফিরে এদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছি। মানুষের ভাত আর ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি। এদেশের মানুষকে এখন আর দুবেলা খাবারের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় যে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন আমি এবং তাঁর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ তা পূরণে সফল হয়েছি'।

মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা আহত শিশুকে মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশে শেখ রেহানা

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মেধা আর মননে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন আর অগ্রগতির সফল রোল মডেল। তারা আরো বলছেন, ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতা দিয়ে নিজেকে শুধু দক্ষিণ এশিয়ারই নয় বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর ও জনপ্রিয় নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আঞ্চলিক রাজনীতির বাইরেও তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছেন। বিশ্বে শান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তিনি অধিকারবঞ্চিত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বুকে তৈরি করেছেন এক নতুন দৃষ্টান্ত। ইউরোপের দেশগুলো যখন সেদেশে আসা ভাগ্যবিড়ম্বিত শরণার্থীদের ক্ষেত্রে বাধা আর নিষেধাজ্ঞার দীর্ঘ বেড়াজাল তৈরি করছে সেখানে জাতিগত বিভেদ আর দাঙ্গার কারণে মিয়ানমার থেকে অত্যাচার আর নির্যাতনে পালিয়ে আসা লাখ লাখ অসহায় রোহিঙ্গাদের এদেশে বাসস্থান ও খাবারদাবারের সংস্থান করে দিয়ে শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে চমকে দিয়েছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কিংবা 'মানুষের জন্য মানুষ'– এই স্লোগানকে সমুন্নত রেখে শেখ হাসিনা আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। শেখ হাসিনা যখন সব বাধাবিপত্তি ভুলে কোনোরকম আপোশ না করে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের টনক নড়ে। তারা তাঁকে প্রশ্ন করলে শেখ হাসিনা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসিকতার সঙ্গে বলেছেন, 'একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের দুই কোটি অসহায়, গৃহহীন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন ভারত যদি আমাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিত তাহলে আমাদের এসব ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষগুলোর কী হতো? আমি উদ্বাস্তু আর ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণা বুঝি– তাই অনেক ঝুঁকি নিয়ে রোহিঙ্গা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি তখন বলেছিলাম, বাংলাদেশের মানুষ যদি দু'বেলা দু-মুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে তাহলে আমাদের ভাগের খাবার দিয়ে রোহিঙ্গাদের খাওয়াতে-পরাতে পারব'।

সেদিন শেখ হাসিনার এ কথায় বিশ্ববিবেক নতুন করে অনুধাবন করতে পারল নেতৃত্বের উদারতা কাকে বলে! শেখ হাসিনার কথা থেকে তারা বুঝে নিয়েছিল তিনি কী বলতে চান, তাঁর কথার মর্মার্থ কী? বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার এই বার্তার ভেতরে নতুন করে যে সত্যটি উপলব্ধিতে আনল তাহলো, বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ হয়ত ক্ষুদ্র আকৃতির কিন্তু এদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই ছোট্ট কথার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবতা আর আর্তের সেবায় মানুষের করণীয় কী

হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ কত বড়ো হৃদয়ের অধিকারী।

রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে নিয়ে বিশ্ব নেতৃত্ব যখন নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করছিলেন তখন শেখ হাসিনা শক্ত হাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি জাতিসংঘ রোহিঙ্গা ইস্যুতে দ্বৈত নীতি গ্রহণ করেছিল– তা বিশ্বে নিন্দিত হয়েছে। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অং সান সুচি রোহিঙ্গা ইস্যুতে যে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছিলেন তা সুস্থ মানুষের কেউ-ই মেনে নিতে পারেনি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে সেদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমর্থন মিলিয়ে সুচির ভূমিকা বিশ্বের সকল মহলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

বলা যায়, একরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে শেখ হাসিনা একাই স্রোতের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বস্তুত, শেখ হাসিনার এই বিষয়টিকে মোটা দাগে মূল্যায়ন করেছেন বিশ্ব

উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবিরে ত্রাণ বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নেতৃবৃন্দ। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ যদি রোহিঙ্গাদের পাশে না দাঁড়াতো তাহলে এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া শুধু এশিয়ার রাজনীতিতে নয় বরং গোটা বিশ্বে পড়ত। শেখ হাসিনা নিজের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা আর নেতৃত্ব দিয়ে এ যাত্রায় সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এখানেই তাঁর বিশাল নেতৃত্বের কৃতিত্ব।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যেখানে সংশয়ের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন তখন শেখ হাসিনা সাগরের মতো বিশালতা নিয়ে বাসস্থান, অন্ন, বস্ত্র দিয়ে তাদের পাশে মায়ের মমতা নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছেন পৃথিবী থেকে এখনো মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি উধাও হয়ে যায়নি। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ভালোবাসা আর মানবতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা নিজের নেতৃত্বের উচ্চতাকে নিয়ে গেছেন অনেক উপরে।

২০১৭ সাল নানা কারণে বর্তমান সরকারের জন্য ইতিবাচক। কারণ এ বছরেই সরকারের দেওয়া নির্বাচনি ইশতেহারের বড়ো দুটি প্রতিশ্রুতি সাফল্য অর্জন করে। পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যান দৃশ্যমান হওয়াসহ দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মূল পর্বের কাজও এসময় শুরু করা হয়। এর মধ্যে মিয়ানমার থেকে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের বিষয়টি সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারে জাতিগত দাঙ্গা চলে আসছিল। তারই ধারাবাহিকতার জেরে ২০১৭ সালের শুরুর দিকে এই পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে, যার ফলে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ছয় লাখের বেশি রোহিঙ্গা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদের আশ্রয়, খাদ্যের ব্যবস্থা এবং স্বদেশে ফেরত পাঠানোর তৎপরতা শুরু করা ছিল সরকারের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। ইতিপূর্বে ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান মিয়ানমারে জাতিগত নিধন বন্ধ করে রোহিঙ্গাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি, তাদের নাগরিকত্ব ও ভোটের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সুচি গত ৫ বছরে সেই দাবি বাস্তবায়ন করেননি। যারা আন্তর্জাতিক বিশ্বের খবর রাখেন তারা জানেন মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর সুচির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী জানে, তাদের পেছনে রয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম শক্তিশালী সদস্য চীন। সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল রাখাইন রাজ্যে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাবে সদস্যভুক্ত ১৫টি রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র চীন বিরোধিতা করে। রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সহিংসতার নিন্দা জানালেও চীন মনে করে মিয়ানমারে সেনাবাহিনী তার দেশে জঙ্গি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে চীনের সমর্থন দেওয়ার পেছনে রয়েছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। মূলত ২০০৪ সালের দিকে রাখাইন রাজ্যে জ্বালানি সম্পদ, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে আগ্রহ বাড়ে চীনের। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে চীনের বেইজিং ও মালাক্কা প্রণালি হয়ে আফ্রিকায় তেল সরবরাহের সুযোগ তৈরি হয়েছে মিয়ানমারের কিয়াউকফিউক হয়ে চীনের কুনমিংকে যুক্ত করা পাইপলাইনের কারণে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, সরকারে আসার পর থেকে নানা রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামাল দিয়ে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, প্রশ্রয়, ভরণপোষণ দিয়ে– তাদের বুকে টেনে নিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেখালেন মানুষের জন্য বুকের ভেতরে ভালোবাসা, সহমর্মিতা থাকলে কোনোকিছুই বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে না। ব্রিটিশ টেলিভিশন চ্যানেল ফোর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বিস্ময়কর ভূমিকার জন্য তাঁকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য শক্তিশালী নেতারাও শেখ হাসিনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ

রোহিঙ্গারা নিজ বাসভূমে পরবাসী

সুফিয়া বেগম

রাখাইনে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন দেখেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ও তাঁর প্রতিনিধিদল। আদি নিবাস রাখাইনে ফিরিয়ে নেবার মতো পরিবেশ রোহিঙ্গাদের জন্য তৈরি হয়েছে কি-না, সেটা নিজের চোখে দেখতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ৯ই আগস্ট চারদিনের সফরে মিয়ানমার যান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা যায়, এই সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলীর মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলরের দপ্তরের মন্ত্রী চ টিন্ট সোয়েরের সঙ্গে মিয়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা হয়। সফরকালে সীমান্তের শূন্যরেখায় অবস্থানরত কয়েক হাজার রোহিঙ্গাদের দেখতে যান দলটি। লা পোয়ে কং এলাকার তাংপিউ লেট ইয়ার ও গা খুয়া ইয়ার দুটি ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল বেশকিছু নির্মাণাধীন (প্রি ফেব্রিকেটেড) বাড়ি দেখতে পান। সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ওপর জোর দেন। রোহিঙ্গাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি বাড়ি ও গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথাও বলেন দলের প্রতিনিধিরা।

রোহিঙ্গা সংকট বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়, রোহিঙ্গা সমস্যা মানবতার সমস্যা। একটি মানবগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন (ethnic cleaning) করার সমস্যা। রোহিঙ্গা সমস্যা আর্ন্তজাতিক বিশ্লেষকদের মতে কাশ্মির সমস্যা, প্যালেস্টাইনের সমস্যার চেয়েও করুণ ও মর্মন্তুদ। তারা রাখাইন প্রদেশের অধিবাসী। তারা অভিবাসী নয়। রোহিঙ্গারা পূর্বপুরুষ থেকে মুসলমান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মিয়ানমারের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে তারা অংশ নিয়েছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা কখনো অস্ত্র হাতে বিদ্রোহ করেনি। কোনো সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটায়নি। রোহিঙ্গা মুসলমানরা নিতান্তই নিরীহ জনগোষ্ঠী। তারা শান্তিকামী। তারা চান মিয়ানমারের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো মাথা উঁচু করে বাস করতে। রোহিঙ্গারা চান নাগরিক অধিকার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মিয়ানমারে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নাগরিক অধিকার পায়নি; এটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

বর্তমান রাখাইন প্রদেশের সাবেক নাম আরাকান। রাজধানী শহর সিতওয়ে, যার পূর্বের নাম আকিয়ার, রাখাইনের নৃগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টান, হিন্দু ও প্রকৃতি পূজারী। ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভাজনের ফলেই রাখাইন প্রদেশে অন্য নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান রোহিঙ্গাদের একটি ফারাক তৈরি হয়ে আসছিল। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর কেউ কেউ বিচ্ছিন্নবাদী এবং স্বাধীনতাকামী। বিভিন্ন সময় মিয়ানমার প্রশাসন বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী তথা ইনসার্জেন গোষ্ঠীগুলোর সাথে শান্তি বা সমঝোতার আলোচনা চালালেও রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের ১৫টি বিদ্রোহী নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা চালানোর পর ৭টি নৃগোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে। সুচির সরকার ক্ষমতায় এলে ১৮টি বিদ্রোহী সংগঠনের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয় এবং শান্তি সম্মেলনে অংশ নেয়। সেখানেও রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয়নি। মিয়ানমার প্রশাসনের রোহিঙ্গাদের ওপর অমানবিক আচরণের মূলে রয়েছে 'এথনিক ক্লিনজিং' বা জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রচেষ্টা। রাখাইন প্রদেশকে রোহিঙ্গামুক্ত করার লক্ষ্যে গণহত্যা, গ্রামগুলোতে আগুন দেওয়া, চাষের জমি দখল, নারীদের ধর্ষণ ও নিপীড়ন, রোহিঙ্গাদের ক্ষেতের ফসল কেড়ে নেওয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনগণ ও বর্মী সেনারা। গবাদি পশু বা গৃহস্থের শেষ সম্বলও কেড়ে নিয়েছে বর্মী সেনারা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো নিষ্ক্রিয় করাসহ মুসলমানদের উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে বর্মী সেনা ও মিয়ানমারের উগ্র বৌদ্ধ সম্পদায়ের লোকেরা।

কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত জনগণকেই ওই দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইংরেজ শাসন আমলে আরাকানে ১৯৩১ সালে যে আদমশুমারি হয়, সে হিসাবে ৩৬ ভাগ আরাকানবাসী ছিল মুসলমান, তাদের প্রজন্ম অবশ্যই আরাকানবাসী। তারা জন্মসূত্রে মিয়ানমারের নাগরিক।

একজন মানুষ দুই বা ততধিক উপায়েই একটি দেশের নাগরিক হতে পারে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড জে লাস্কি তাঁর নাগরিক সংজ্ঞায় বলেছেন, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলা যায়। সুতরাং নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি ঐ রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান এবং অন্যান্য নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন, রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিজের কর্মের মাধ্যমে ভূমিকা রাখেন। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে সমাজের সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নাগরিক হিসেবে একত্রে সহঅবস্থান করতে পারে। রাখাইন প্রদেশের মুসলমানরা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনসহ নিজ নিজ কর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করেছে। ইতিহাস তা-ই সাক্ষ্য দেয়। অথচ তাঁরা রাষ্ট্রের নাগরিক নয়– এরচেয়ে বড়ো হঠকারিতা আর কি হাতে পারে? মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মোট জনসংখ্যা ৮৯ শতাংশ। ১১ শতাংশ মুসলিম, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও প্রকৃতি পূজারী। দেশটিতে বৌদ্ধ মৌলবাদ

প্রবল আকারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর অবিশ্বাস্য রকম নিপীড়ন শুরু হয়। ফলে জন্ম দেয় কিছু বিচ্ছিন্নবাদী ও চরমপন্থি সংগঠন। কচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মি, কচিন ইনডিপেনডেন্স অর্গানাইজেশন, রেস্ট্রোরেসন কাউন্সিল অব শান স্টেট, শান স্টেট ন্যাশনাল আর্মি, কায়েন ন্যাশনাল ইউনিয়ন, ডেমোক্রেটিক কায়েন, বুদ্ধিস্ট আর্মি, বেনেভোলেন্ট আর্মি, নিউ মন স্টেট পার্টি, আরাকান লিবারেশন পার্টি, আরাকান ন্যাশনাল কাউন্সিল, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, আরাকান চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ন্যাশনাল সোশালিস্ট আর্মি ও কাউন্সিল অব ন্যাশনাল খাপলাঙ্গ। কচিন ও কায়েন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মিয়ানমার প্রশাসনকে সবচেয়ে বেশি নাজেহাল করে রেখেছে। তবে অন্যান্য নৃগোষ্ঠী চায় স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা। রোহিঙ্গারা চায় নাগরিক অধিকার। তারা সংগঠন করেছে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভিত্তিতে নয়, একমাত্র মানুষের মতো বাঁচার তাগিদে। নাগরিক অধিকার পাবার লক্ষ্যে তাঁরা বিদ্রোহ করেছে। তারা চায় মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি।

পালিয়ে আসা নির্যাতিত ও নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে জাপান বার্মা দখল করলে, মাতৃভূমিকে দখলমুক্ত করতে রোহিঙ্গারা ছিল সম্মুখ কাতারে। সে সময়ে রোহিঙ্গাদের সাহস, শৌর্য কোনোভাবেই উপেক্ষার বিষয় ছিল না। বার্মার শ্রদ্ধেয় নেতা, জাতীয় হিরো অং সান (যিনি অং সান সুচির পিতা), তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশমাতৃকার জন্য কাজ করেছে মুসলিম রোহিঙ্গারা। বার্মার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করেছেন কয়েকজন সংগ্রামী রোহিঙ্গা নেতা। এদের মধ্যে রোহিঙ্গা নেতা ইউ রাজ্জাক অন্যতম। শীর্ষ নেতা অং সানের আমলে ইউ রাজ্জাক শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন এবং সুচির পিতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। দেশ গঠনে রোহিঙ্গাদের অবদান থাকলেও সুচি তা অস্বীকার করছেন। এক সময়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীক সুচি বর্তমানে মিয়ানমারের সরকার প্রধান। তিনি একসময়ে সামরিকবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে নির্বাক রোহিঙ্গা প্রশ্নে। কেন তিনি নির্বাক? এ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সুচির মনে মুসলমানদের নিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল বাল্যকাল থেকেই। তিনি থেরাবাদী বৌদ্ধ। পিতার উদারনৈতিক জীবনাচারে তিনি অভ্যস্ত হতে পারেননি। শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই সুচি এমন এক মিয়ানমার গড়ে তুলতে চান– সেখানে মানুষের অধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একক রাষ্ট্র হবে মিয়ানমার। তিনি শান্তি ও বন্ধুত্বে নয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সচেতন মানুষ তা-ই মনে করছেন। রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের বিষয়ে সুচির অমার্জনীয় ঔদাসিন্যতা তাঁর বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন, ঘৃণা দেখেও ঔদাসিন্য দেখাচ্ছে এবং এ ধরনের জঘন্য কাজকে নীরব সমর্থন জোগাচ্ছে।

মিয়ানমারের সাম্প্রতিক ঘটনার মূলে রয়েছে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্পদ। বর্মীরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী আর রোহিঙ্গারা মুসলমান ও কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বর্মীদের গায়ের রং বাদামি আর রোহিঙ্গাদের কালো।

১৮৮৫ সালে ব্রহ্মদেশের সর্বশেষ রাজা ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে সূচনা হয় ঔপনিবেশিক শাসনের। সেই সঙ্গে অবসান হয় বৌদ্ধ রাজতন্ত্রের। ব্রিটিশ শাসনামলে বর্তমান মিয়ানমারের নামকরণ হয় বার্মা। পরে মিয়ানমারের সামরিক সরকার ১৯৮৯ সালে দেশটির নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখে। মিয়ানমারের জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। এর মধ্যে ৮৯ শতাংশ বৌদ্ধ, ৫ শতাংশ মুসলিম, ৪ শতাংশ খ্রিষ্টান ও ২ শতাংশ হিন্দু। এই দেশটিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বলছে, মিয়ানমারে ১৩৫টি নৃগোষ্ঠী রয়েছে। যারা মোট জনগোষ্ঠীর ৩০ শতাংশ। কচিন, কায়েন, চিন, মন, রাখাইন, কাহিম ও তাইয়া জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে।

রাখাইন সাবেক আরাকান অঞ্চল। বার্মার একটি প্রদেশ। পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। উত্তরে চীন, পূর্বে ম্যাগওয়ে এবং ইয়ারওয়ার্দি অঞ্চল। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম। আরাকান পর্বত, যার সর্বোচ্চ চূড়া ভিক্টোরিয়া শৃঙ্গের উচ্চতা ৩,০৬০ মিটার। যা রাখাইন প্রদেশকে মূল বার্মা থেকে পৃথক করে রেখেছে। রাখাইন রাজ্যে বেদুবা এবং মাইঙ্গান দ্বীপের মতো বড়ো কিছু দ্বীপ আছে। রাখাইন রাজ্যের আয়তন ৩৬,৭৭৮ বর্গকিলোমিটার। বর্মীরা রাজধানীর নাম সিতওয়েকে উচ্চারণ করেন 'সিকটুয়ে'।

২০০৪ সালের বার্মার আদমশুমারি অনুযায়ী রাখাইনের জনসংখ্যা ৩১,১৮,৯৬৩ জন। জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রাখাইন, রোহিঙ্গা ও বাঙালি রয়েছে। ধর্ম থেরাবাদী বৌদ্ধ, ইসলাম ও হিন্দু।

মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার মান খুবই নিম্ন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলমান ও হিন্দুদের ক্ষেত্রে। সামরিকজান্তার সরকার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করছে জিডিপির শতকরা ৩ ভাগ। পৃথিবীর এমন কোনো সভ্য দেশ নেই যেখানে এত কম ব্যয় বরাদ্দ আছে। স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে হলেও সরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোতে রোগীকে ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে হয়। রাখাইন রাজ্যের মতো দুর্গম স্থানে স্বাস্থ্যসেবার এমন দৈন্যদশা সভ্য সমাজে নেই বললেই চলে।

ইয়াঙ্গুন এবং মান্দালয়ের বাইরে শিক্ষা সুবিধা অতিমাত্রায় অপ্রতুল। রাখাইন রাজ্যে মোট রোহিঙ্গা মুসলমানের মধ্যে শতকরা ১০ জন বিত্তশালী। বিত্তশালী রোহিঙ্গা নারীরা বোরখা বা হিজাব পরে। পুরুষরা মাথায় টুপি ও কেউ কেউ দাড়ি রাখে। একটু সচ্ছল যারা তারা শতকরা ৯০ ভাগ রোহিঙ্গা মুসলমানের চাইতে আলাদা– চালচলন ও জীবন আচারে। অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র, তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। বিত্তবান মুসলমানরা টুপি পরে, দাড়ি রাখে, পাঞ্জাবি পরে

ঠিকই, রোজা-নামাজের প্র্যাকটিস তাদের নেই। নারীরাও তথৈবচ। তবে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কর্মঠ।

১৯৬২ সালে বার্মার সামরিক সরকার আরাকান নামের পরিবর্তন করে রাখে রাখাইন স্টেট। তবে '৮৯ সালের ১৮ই জুলাই থেকে বার্মার নামকরণ হয় মিয়ানমার। আমরা যাদের বর্মী বলি তারা নিজেদের বলেন 'ম্রনমা'। ধারণা করা হয় 'ম্রনমা' থেকেই মিয়ানমার নামকরণ হয়েছে। বর্মী ভাষায় মিয়ানমার নামটা উচ্চারণ হয় 'মিয়ানমা'। বর্মী ভাষাকে বলা হয় 'ম্রনমা'।

আরাকানের সবাই মঙ্গোলীয়দের মতো দেখতে না। রাখাইন রাজ্যে ধর্মের ভিত্তিতে যারা থেরাবাদী বৌদ্ধ তারা দেখতে বর্মীদের মতো। যারা রোহিঙ্গা, তারা দেখতে বাংলাদেশের জনগণের মতো। তাদের সিংহভাগ মুসলমান। আরাকানের রাজধানীর নাম আকিয়াব, এখন যার নাম শিতুই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরম মমতায় কাছে টেনে নেন এক রোহিঙ্গা নারীকে

আকিয়াব শহরের কাছের মসজিদটি অত্যন্ত প্রাচীন। যার স্থাপত্য রীতি গৌড়ীয়। এতে প্রমাণ হয়, আরাকানে মুসলমানদের বসবাস প্রাচীনকাল থেকে। উত্তর আরাকান মুসলিম প্রধান অঞ্চল। উত্তর আরাকানে চট্টগ্রামের ভাষা ব্যবহার হয়। বার্মার মূল ভূখণ্ডে অর্থাৎ ইরাবতী নদীর উপত্যকায় যেসব থেরাবাদী বৌদ্ধ বসবাস করে তারা গোমাংস ভক্ষণ করে না কিন্তু আরাকানি বৌদ্ধরা গোমাংস ভক্ষণ করে। তাদের জীবনাচার ও রন্ধন প্রণালি কিছুটা রোহিঙ্গাদের মতো।

১৪৩০ সাল থেকে রোহিঙ্গারা আরাকানে বসবাস করে আসছে। বর্মী রাজা আরাকান রাজ্য দখল করলে আরাকানের রাজা গৌড়ে পালিয়ে আসেন। গৌড়ের সুলতান আরাকান রাজ্য যুদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করে আরাকান রাজা মেং সোয়া ম ফিরিয়ে দেন। সে সময় গৌড় থেকে আসা কিছু সৈন্য আরাকানে থেকে যায়। রাজা মেং সোয়া মউন আরাকানের রাজধানীর নামকরণ করেন রোহং। রোহং শহরে বসবাস করতে থাকেন গৌড় থেকে আসা কিছু মুসলিম সৈন্য। এদের বংশধররাই রোহং শহরে যুগ যুগ ধরে বাস করে আসছে।

অবশ্য মিয়ানমার প্রশাসন বলছে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে আসে রোহিঙ্গারা। কিন্তু ইতিহাস বলছে অন্য কথা। মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুজাউদদৌলা আওরঙ্গজেবের হাতে পরাজিত হন এবং ঢাকায় পালিয়ে আসেন। একসময় তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে আরাকানে চলে আসেন। মতবিরোধের কারণে আরাকান রাজা সুজাউদদৌলাকে সপরিবার হত্যা করেন। সুজাউদদৌলার কিছু সৈন্য ও লোকবল রোহিঙ্গা মুসলিম পরিচয়ে আরকানে থেকে যায়। সে অর্থে মোগল আমল থেকেই রোহিঙ্গারা আরাকানে বসবাস করে আসছে। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি বার্মায় যায়নি। তারা মুসলিম মৌলবাদী নয়। আরাকান তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটা, তাই আরাকানে তাদের উত্তরপুরুষদের বসবাসের অধিকারটিও মৌলিক।

আরাকান তখনো বার্মার অংশ হয়নি। আরাকান রাজারা চট্টগ্রাম থেকে অনেক মুসলমান নিয়ে যান সেখানে চাষাবাদের জন্য। কালক্রমে তারা রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিতি পায়। যেহেতু তারা মুসলমান এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস শুরু করে, সে হিসেবে তারা মুসলিম রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী নুমান কুরুতুলাস বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনকালে ত্রাণ বিতরণ করেন

বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সব ধর্মের জনগণ এখানে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার পায়। মিয়ানমার ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। আর রাষ্ট্রধর্ম থেরাবাদী বৌদ্ধ। বার্মার রাজনীতিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেদেশে সেনাবাহিনীর পরেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্থান।

চট্টগ্রাম এক সময় ছিল আরাকান রাজার অধীনে, তখন আরাকানের রাজধানী ছিল রোহং– যা

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান

দাস ব্যবসার বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাস বিচিত্র। চট্টগ্রাম কখনো আরাকানের অধীনে কখনো মুসলিম সুলতানদের দখলে ছিল। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মার সাধারণ জনগণ আর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এক প্লাটফরমে ছিল না। আরাকানের মুসলমানরা ছিল ব্রিটিশদের পক্ষে আর জাপানের পক্ষে ছিল থেরাবাদী বৌদ্ধরা। কথিত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন আরাকানের মুসলমানদের আশ্বস্ত করেছিল, যুদ্ধে জিতে গেলে উত্তর আরাকানকে পৃথক প্রদেশ করবে। উত্তর আরাকান মুসলিম প্রধান অঞ্চল। ধর্মীয় কারণে বর্মীরা কখনো রোহিঙ্গাদের প্রতিবেশী বা আপন ভাবেনি। যদিও দেশের ক্রান্তিকালে, রাজনৈতিক অবস্থানে এমনকি প্রশাসনে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ছিল প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল। সুদূর অতীতে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্মী সেনাদের অত্যাচারে অনেক মুসলিম রোহিঙ্গা আরাকান থেকে পালিয়ে এসে চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল।

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ বর্মীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সময়, কারণ উক্ত খ্রিষ্টাব্দেই বর্মী রাজা বাদোবপায়া আরাকান রাজ্য জয় করেন। রাজা বাদোবপায়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলেছিলেন– ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তখন এই অঞ্চল তিনটি আরাকান রাজাকে কর প্রদান করত। যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। ইংরেজ আমলে আরাকান ছিল বার্মার একটি বিভাগ। উক্ত বিভাগে ছিল ৪টি জেলা। পার্বত্য আরাকান, আকিয়াব, সান্ডোয়ে এবং কায়েক পিউ।

মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হুইয়াং বরাবরই বলে আসছেন, রোহিঙ্গা মুসলমানরা মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী নয়। মিয়ানমারের যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত স্কটমাশিয়েলের সঙ্গে ১২ই অক্টোবর ২০১৭ সালের এক বৈঠকে মিয়ানমারের সেনা প্রধান বলেন, রোহিঙ্গারা বাঙালি এবং এইসব সংখ্যালঘু মুসলিম মিয়ানমারের জন্য ক্ষতিকর বলেও তিনি অবহিত করেন। এর আগেও ১৬ই সেপ্টেম্বর সেনাপ্রধান মিন অং হুইয়াং বলেছিলেন– রোহিঙ্গারা নাগরিক স্বীকৃতি দাবি করছে অথচ তারা কখনো মিয়ানমারের নৃগোষ্ঠী ছিল না। এটি একটি বাঙালি ইস্যু। তারা কোনোদিনই মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী নয়। নথিপত্রে প্রমাণ করে তারা কখনোই রোহিঙ্গা নামে পরিচিত ছিল না। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই তারা বাঙালি হিসেবে পরিচিত ছিল। মিয়ানমার তাদের এদেশে নিয়ে আসেনি। ঔপনিবেশিক আমলেই তারা মিয়ানমারে এসেছিল।

১৯৪৭ সালে পাক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও মিয়ানমার তখনো ব্রিটিশদের অধীনে। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মদেশের সর্বশেষ রাজা ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হয়। শুরু হয় বার্মায় ঔপনিবেশিক শাসন এবং অবসান হয় বৌদ্ধ রাজতন্ত্রের। আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে ছিল মিয়ানমারের গভীর সম্পর্ক। ব্রিটিশ শাসনামলে বার্মা এই উপমহাদেশের সঙ্গে অধিভুক্ত ছিল। ১৯৩৭ সালে বার্মা পৃথক প্রশাসনের আওতায় আসে। ১৯৪৮ সালের দিকে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল করাচি গিয়ে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের রাখার জন্য দাবি জানান। লীগ নেতারা তাদের এই দাবিকে গ্রাহ্য করেননি এবং এই দাবি ব্রিটিশ কর্মকর্তারাও গুরুত্ব দেননি। ইতোমধ্যে দাবি আন্দোলনে রূপ নেয়। বার্মার জাতীয়তাবাদী নেতা সুচির বাবা অং সান চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেসময় রোহিঙ্গা মুসলমানদের দাবির বিষয়টি অং সান গুরুত্ব দিয়ে জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব অং সানকে স্পষ্ট করে জানান– আরাকানকে পাকিস্তানে নেবার কোনো আগ্রহ নেই। পাক ভারত ব্রিটিশদের শাসনমুক্ত হবার এক বছরের মধ্যে অং সানের নেতৃত্বে বার্মাও স্বাধীনতা লাভ করে। এর দুমাসের মধ্যে আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত হন।

ব্রিটিশ আমলে উত্তর আরাকান ভিন্ন প্রদেশে রূপ দেবার জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানরা দাবি জানিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের রোহিঙ্গা মুসলমানদের সেই দাবিও ব্রিটিশ প্রশাসন আমলে নেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে থাকার প্রস্তাবও গ্রাহ্য করেনি, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তান প্রশাসন। মানুষ হিসেবে, নাগরিক হিসেবে বাঁচার লড়াইয়ে বরাবরই সোচ্চার ছিল রোহিঙ্গা মুসলমানেরা। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার দেশ বার্মা বা মিয়ানমার। আধুনিক রাষ্ট্র কোনোদিনই এক ভাষাভাষী ও এক ধর্মাবলম্বীদের দিয়ে হতে পারে না। মিয়ানমার প্রশাসনও তা জানে, কিন্তু মানে না। ফলে মিয়ানমার দেশটিতে অধিকারবঞ্চিত কিছু বিচ্ছিন্নবাদী ও চরমপন্থি সংগঠন গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মিয়ানমার প্রশাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ কিন্তু এদের মধ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানরা বিচ্ছিন্নবাদী ও চরমপন্থি নয়। তারা মিয়ানমারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু। তারা অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতো মিয়ানমারের নাগরিক। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকারসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার খর্ব করতে পারে না, কোনো অজুহাতে জাতিগত নিধন চালাতে পারে না। দুটি অপরাধে রাখাইনের মুসলমানদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। প্রথমত রোহিঙ্গারা মুসলমান, দ্বিতীয়ত তারা বাংলাদেশের জনগণের মতো দেখতে। তারা মঙ্গোলীয় নয় এবং তাদের ভাষা বাংলা। ভাষা ও ধর্মের কারণে কোনো নৃগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

রাখাইন প্রদেশের বাইরে রোহিঙ্গারা যেতে পারবে না। দুটি সন্তানের বেশি নেওয়া যাবে না। সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। এসব বাধ্যবাধকতা একরকম জোর করেই রোহিঙ্গাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে– মিয়ানমারের ইয়াওয়াদ্দী উপত্যকায় থন্টন গ্রামের প্রবেশপথে লিখিত আছে, এখানে কোনো মুসলমান ঘর ভাড়া করতে পারবে না। এখানে কোনো মুসলমান বার্মিজ মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না। এখানে কোনো মুসলমানের রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ।

বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারের জনগণ যেমন এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে, এই অঞ্চলের জনগণও মিয়ানমারে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। বার্মা বা ব্রহ্মদেশের নাম বর্তমানে মিয়ানমার। রাজধানী রেঙ্গুনের নাম ইয়াংগুন। চট্টগ্রাম সংলগ্ন আরাকানি সংস্কৃতির ভূখণ্ড রাখাইন। রাখাইন বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা। রাখাইনের বৌদ্ধরা যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদী তেমনি ভিন্ন জাতিসত্তার। মুসলিম ও হিন্দুরা কিছুটা শান্তিপ্রিয়। তারা সামাজিক সংঘাতে অভ্যস্ত নয়। শান্তিপ্রিয় ও সামরিক সংঘাতে অভ্যস্ত নয় এমন মুসলিম ও হিন্দুদের সঙ্গে রাখাইন গোত্রের উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধদের সংঘাত মূলত আবহমানকাল ধরে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (২৫শে আগস্ট ২০১৭ সাল) তীব্র সহিংসতার শুরু থেকে এখনো সক্রিয় আছে। দীর্ঘদিন ধরে কায়েমী স্বার্থ প্রয়োগ, জমি-ভিটা, অর্থসম্পদ লুণ্ঠন সেইসঙ্গে অমানবিক গণহত্যা শাসক শ্রেণির সমর্থনেই চালিয়ে এসেছে মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর।

আরাকানের বৌদ্ধরা যারা তিব্বতি চীনের সমগোত্রীয় তারা রোহিঙ্গাদের আরাকানের অধিবাসী বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের একাংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বার্মায় বসবাসের ফলে প্রচুর জায়গাজমি ও বিত্তের মালিক হয়। এগুলোই রোহিঙ্গাদের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে। বার্মার সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। ধানি জমির ফসল এবং চাষের জমি ও বেঁচে থাকার অবলম্বন কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

রোহিঙ্গা শিশুদের মাঝে ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত প্রিয়াংকা চোপড়া

রাখাইনের রোহং শহরে রোহিঙ্গাদের বাস। অথচ 'রোহিঙ্গা' শব্দটি এখানে নৃগোষ্ঠী হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। 'মুসলিম সংখ্যালঘু' হিসেবে রোহিঙ্গারা রাখাইনে বসবাস করে এসেছে। পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই কেউ স্থায়ী বাসিন্দা নয়। সবাই কমবেশি বহিরাগত। বর্মিরাও বহিরাগত। পিউ ও মুন নামের দুটি মঙ্গোলীয় উপজাতি প্রায় ১৩ হাজার বছর পূর্বে বার্মায় বসতি স্থাপন করে। এরা ছিল হিংস্র, ধর্ষক ও লুণ্ঠনকারী। মূলত এরা বর্মী নামে পরিচিত। অবশ্য মঙ্গোলীয় জাতির একটি অংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ৩ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে। প্রথমে তারা পাহাড়ে বসবাস করে। কালক্রমে তারা ছড়িয়ে পরে তিব্বত, ভুটান, নেপাল ও সিকিমে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা বার্মার (পার্বত্য আরাকান যা চীনের অংশ) পাহাড় অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসেছে। বর্মিরা মিয়ানমারে এসেছে আগে, রোহিঙ্গারা এসেছে পরে। উভয়েই বহিরাগত। সে হিসেবে মিয়ানমারে থেরাবাদী বৌদ্ধরাও স্থায়ী বাসিন্দা নয়; তারাও বহিরাগত।

১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত রেঙ্গুন (বর্তমানের ইয়াংগুন) জাপানিদের দখলে ছিল। জাপানিদের উদ্যোগেই গঠিত হয়েছিল বার্মা ইনডিপেন্ডেন্ট আর্মি। বার্মার স্বাধীনতার জন্য বর্মিনেত্রী অং সান সুচির পরলোকগত পিতা জেনারেল অং সান ও বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি জাপানিদের সমর্থন করে। তখন সুচির পিতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন কয়েকজন মুসলিম রোহিঙ্গা ও বাঙালি হিন্দু নেতা যারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। বার্মাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করে জাপানি মার্শাল তেজোর বাহিনীর হাতে তুলে দেয় সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত বর্মিরা। যাদের দেশপ্রেম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯৪২ সালে জাপানি বাহিনীর সহায়তায় ব্রিটিশদের হাত থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেয় বর্মিরা। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ জনের মধ্যে সুচির পিতা অং সান, উনু আর নেউইন সিংহভাগে ছিলেন। কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছেন সুচির পিতাই। এরাই তৎকালীন আমলে 'বার্মিজ স্বাধীন সেনাবাহিনী' গড়ে তুলেছিলেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এই ৩০ জন বর্মিকে জাতীয় হিরো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই পাক ভারত উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত ইংরেজ উপনিবেশ থেকে ১৯৪৭ সালে বেরিয়ে এলেও বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৮ সালে দেশটি স্বাধীন হলেও দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। ১৯৬২ সাল থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশটিতে সামরিক শাসন বলবৎ ছিল। ২০১৫ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হলেও সংখ্যালঘুদের নিয়ে চলার পথ দেশটিতে মসৃণ হয়নি। বিশেষ করে মুসলিম রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে। একটি দেশে সামরিক শাসন তখনই প্রাধান্য পায় যখন সব মতবাদের জনগোষ্ঠীকে নিয়ে দেশ এগোতে পারে না। যেমন পারেনি মিয়ানমার। তাই দেশটিতে সামরিক শাসন প্রাধান্য পেয়েছে। সুচির আগে ছিল উনু তার আগে নে উইন। মিয়ানমারের মূল সমস্যাকে কেউ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেনি।

মিয়ানমারের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের প্রাক্কালে দেশটিতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। ১৯৬২ সালে সেনাপ্রধান নে উইন ক্ষমতা দখল করে। দেশটিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয়। ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে সুচির দল এনএলডি জয়লাভ করলেও দেশটির সেনা শাসনের অবসান হয়নি। ২০১৫ সালেও সুচির নেতৃত্বে এনএলডি জয়লাভ করে।

মিয়ানমারের সংবিধানে পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্নকক্ষের ২৫ শতাংশ আসন সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, সীমান্ত ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ও সেনাবাহিনীর হাতে। বর্তমানে অং সান সুচি স্টেট কাউন্সেলর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। মিয়ানমারে প্রদেশ রয়েছে ১৪টি। ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইনের বেড়াজালে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ২০১২ সালে দেশটিতে ব্যাপক দাঙ্গা হয়। তবে ১৯৭৮ সালেই নিপীড়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বিতারণ শুরু হয়। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয় ১৯৮২ সালে এবং ২০১৫ সালের আদমশুমারি থেকে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে বাদ দেওয়া হয়।

বর্মি প্রশাসন রোহিঙ্গাদের আরাকান থেকে তাড়াতে চাচ্ছে বর্মি জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে। বর্মি প্রশাসন যতবারই বলবে ব্রিটিশ শাসন আমলে রোহিঙ্গারা আরাকানে এসেছে, কিন্তু ইতিহাস দেবে ভিন্নতর সাক্ষী। বহুপূর্বে রোহিঙ্গারা আরাকানে এসেছে। স্থলপথে, সমুদ্রপথে নয়। ব্রিটিশ শাসন আমলে কিছু মুসলমান অবশ্য আরাকানে গিয়েছিল জীবিকার সন্ধানে। বৌদ্ধদের তুলনায় ইংরেজ আমলে মুসলমানরা ছিল শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে। অনেক মুসলমান সে সময় সরকারি চাকরি করেছে। আকিয়াব ও চট্টগ্রামের মধ্যে যে সমস্ত জাহাজ চলাচল করত তার মাঝিমাল্লা ও সারেংরা ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান। ব্যবসা-বাণিজ্যেও আরাকানের মুসলমানরা এগিয়েছিল। বার্মা তখনও ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত। তবে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সমুদ্রপথে বহু লোক ভাগ্যান্বেষণে বার্মা যান। বার্মার ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি ছোটোবড়ো চাকরিতে কর্মরত

ছিলেন বহু মুসলমান। এক হিসাব মতে, সেসময় ১০ লাখের বেশি লোক বার্মায় যান ভাগ্যান্বেষণে। তখন কিন্তু বর্মিরা হয়ে উঠেন নিজ দেশে পরবাসী। আজকের রোহিঙ্গারা যেমন নিজ দেশে পরবাসী। একদিকে বর্মি জাতীয়তাবাদ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী, অন্যদিকে অন্য প্রদেশ থেকে আসা জনগণ বিশেষ করে মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয় বর্মিদের বিরোধ। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানরা ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও সূত্র মতে, ব্রিটিশ আমলে যেসব মুসলমান বার্মায় আসে তাদের তুলনায় মুসলিম শাসন আমলে বার্মায় আসে বেশি সংখ্যক।

মুসলমান, যারা রোহং শহরে একত্রে বসবাসের জন্য রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিতি পান। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর আরাকান যদি পৃথক রাষ্ট্র হতো এবং ইংরেজ আমলে যদি বার্মার সাথে যুক্ত না হতো তবে আজকের রোহিঙ্গা সংকটের উদ্ভব হতো না। ২০১৭ সালের ২৪শে আগস্ট ৪০০ জন বিদ্রোহী রোহিঙ্গা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং ৯ জনকে হত্যা করেছে। এই অভিযোগ কতখানি সত্য! তদন্ত করে দোষীকে শাস্তি দেওয়া যেত। এই অজুহাতে নিরস্ত্র সাধারণ রোহিঙ্গাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন করে তাদের গ্রাম ছাড়া করেছে স্থানীয় উগ্র বৌদ্ধ আর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। ধর্মীয় নেতা ও উগ্রবাদী বর্মি তরুণরাও সহযোগিতা করছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে। নিজ গ্রামে সহিংস্রতার শিকার হয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান। সহিংসতার তীব্রতা দেখে আঁতকে উঠছে বিশ্বমানবতা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মিয়ানমার কেন্দ্রিক ভূরাজনৈতিক আত্মস্বার্থ রক্ষায় চীন, রাশিয়া ও ভারত কৌশল প্রয়োগে কে অগ্রগামী হয় সেটি দেখবার বিষয়, যদিও মিয়ানমারে চীনা বিনিয়োগ উপেক্ষার বিষয় নয়। চীনের প্রতি একধরনের আনুগত্য পোষণ করেই টিকে রয়েছে মিয়ানমার।

প্রায় ১ হাজার বছর আগে বর্তমানে মিয়ানমারে জনবসতির অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। ১৩ শতকের দিকে মিয়ানমারে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাজ্য সৃষ্টি হয় আভা, আরাকান ও হানথাবতী। মণগোষ্ঠীকে ইরাওয়ার্দি

উখিয়ার কুতুপালং-এ রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির

উপত্যকায় আবাস গড়া প্রথম জনগোষ্ঠী মনে করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকের মাঝে তারা দক্ষিণ মিয়ানমারে আধিপত্য বিস্তার করে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে পিউদের আগমন ঘটে। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে তারা নানঝাও রাজ্যের আক্রমণের শিকার হয়। নবম দশকের পূর্বে কোনো একসময় বর্মিরা বর্তমান তিব্বত থেকে ইরাওয়াদ্দি উপত্যকায় আসতে শুরু করে। ৮৪৯ সালে তারা পাগানকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে। যা একসময় বর্তমান মিয়ানমারের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকাজুড়ে বিস্তার লাভ করে। ১১০০ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরাট এলাকাজুড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে কুবলাই খা পাগান রাজ্য দখল করে। ১৩৬৪ সালে বর্মিরা রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিয়ানমারে জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। জাপানিদের সহায়তায় ব্রিটেনের উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আসে বর্মিরা। তৎকালীন বার্মা থেকে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত হয়। পরে বর্মিরা জাপানিদেরও বিতাড়ন করে বার্মাকে স্বাধীন করে। এসময় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কয়েকবার অং সানের সঙ্গে রেঙ্গুনে গোপনে বৈঠক করে। দুজনের মধ্যে এক ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল– একযোগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্ব স্ব দেশকে স্বাধীন করতে কাজ করবে। দুজনের সঙ্গে মধ্যস্থতায় ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মি. দিনা নাথ। যার বার্মিজ নাম ছিল দত্ত কাহন থেইন খেইয়েন। তিনি তার রেঙ্গুনের বাড়িটির একাংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন গোপন বৈঠকের জন্য। দিনা নাথ পরে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ১৯৪৭ সালে দিল্লির লাল কেল্লায় এক বছর কারাভোগে ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বার্মা স্বাধীন হয়। আর ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কথিত আততায়ীর হাতে অং সানও মৃত্যুবরণ করেন।

আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে বার্মার পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং বিবদমান তিনটি গোষ্ঠীর শান, কায়েন ও চীনাদের সাথে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করান অং সান। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে উক্ত তিনটি উপজাতি স্বাধীনতা চেয়েছিল। সেই লক্ষ্যে সহযোগিতা চেয়েছে ব্রিটেনের। কিন্তু ব্রিটেন এই অঞ্চলগুলো স্বাধীন করেনি চীনের সঙ্গে বর্তমানে এই তিন উপজাতীয় অঞ্চলের ভূকৌশলগত অবস্থানের কারণেই। সংগ্রামী নেতা অং সানের সঙ্গে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছায়ার মতো ছিলেন কয়েকজন রোহিঙ্গা নেতা। বাঙালি বিপ্লবী নেতা হরিনারায়ন ঘোষাল, ডাক্তার অমর নাগ, সুবোধ মুখার্জী ছিলেন অং সানের ছায়াসঙ্গী।

তিনটি উপজাতির মধ্যে চুক্তি হয়েছিল কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। উপরন্তু বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অঞ্চলে। তারপরও ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন চালু হয়নি দেশটিতে। তবে অন্যান্য অঞ্চলের মতো রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা আরাকান যার বর্তমান নাম রাখাইন, এ অঞ্চলেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মূলত অসম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের লক্ষ্যে তৎকালীন রোহিঙ্গারাও বিদ্রোহ করে। ১৯৬২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা নে উইন ক্ষমতা দখল করলে রোহিঙ্গাদের জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে।

২৭শে মে ১৯৯০ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মিয়ানমারে। এই নির্বাচনে অং সান সুচির দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি' (এনএলডি) ৪৯২টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসন পায়। নির্বাচন বাতিল করা হয়। সেসময়ই রেঙ্গুন নামটি সামরিক শাসকরা পরিবর্তন করে রাখেন ইয়াংগুন। নভেম্বর ২০০৫ সালে ইয়াংগুন রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ইয়াংগুন থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নতুন শহর নেপিডোকে রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয়। অতঃপর সুদীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয় সুচির দল এনএলডি। সেই থেকে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়।

বাহ্যিক গণতন্ত্র এলেও দেশটিতে জাতিগত প্রশ্নে সহিংস সংগ্রাম চলতেই থাকে। যা এখনো অব্যাহত আছে।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন

শামস সাইদ

রাজনৈতিক শিক্ষা সারাজীবন থাকলেও শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আসা একটা ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে। এভাবে রাজনীতিতে আসতে চাননি তিনি। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করেছে সময়। তা বাংলার মানুষের চাহিদা হোক আর বাবার স্বপ্ন পূরণই হোক–এর মধ্য দিয়েই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ।

১৯৮১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৪, ১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা ঐক্যের প্রতীক হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দীর্ঘ ৬ বছর পর বাংলার মাটিতে পা রাখেন শেখ হাসিনা। ১৯৮১ সালের ১২ই জুন শেখ হাসিনার কাছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতায় আরোহণকে অবৈধ ঘোষণা করে এরশাদ-বিরোধী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন শেখ হাসিনা। নেমে পড়েন রাজপথে। ১৯৮৩ সালে তিনি ১৫ দলের একটি জোট গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশজুড়ে সামরিক শাসক এরশাদ-বিরোধী দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠায় ১৯৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের ৩১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে সরকার। চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে।

১৯৮৪ সালে তিনি আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের কংগ্রেসে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৮৫ সালে ইয়াসির আরাফাতের আমন্ত্রণে তিউনেশিয়ায় ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (PLO) সদর দফতর সফর এবং মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

১৯৮৬-র সংসদ নির্বাচনে তিনি সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালের ৩রা জানুয়ারি শেখ হাসিনা পুনরায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন।

১৯৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর শেখ হাসিনাকে গৃহ-অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯৮৭ সালে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স নামে সংগঠনের আমন্ত্রণে শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোয় অনুষ্ঠিত নারী নেত্রীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন বিশেষ অতিথি হিসেবে। ১৯৮৮ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের সপ্তম কংগ্রেসে তিনি পাঠ করেন 'নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ। একই বছর যোগদান করেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে প্রাগে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়াম বৈঠকে।

১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে পুলিশ ও বিডিআর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় অল্পের জন্য শেখ হাসিনার জীবন রক্ষা হলেও নিহত হন ৯ সাধারণ নেতা-কর্মী-সমর্থক।

১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর আন্দোলনের জোয়ার ঠেকাতে সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সরকার এবং শেখ হাসিনাকে ধানমন্ডির বাসায় গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন শেখ হাসিনা। এরপর পতন ঘটে এরশাদের।

১৯৯১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সংসদ উপনির্বাচনের সময় সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালের ৭ই মার্চ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১০০ সংসদ সদস্য শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গোলাম আযমকে গণ-আদালতে বিচারের

দাবির সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করেন। ১৯৯২ সালের ১৬ই এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল করে গোলাম আযমের বিচার করার প্রস্তাব দেন শেখ হাসিনা। ১৯৯২ সালের ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সম্মেলনে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু-কন্যা।

১৯৯২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তিনি। একই বছর যোগদান করেন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনে। ১৯৯২ সালে তিনি গৌতম বুদ্ধের কর্ম ও চিন্তাধারার ওপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষে নেপাল এবং ওই বছরই পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত সার্ক দেশগুলোর পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের সভায় যোগদান করেন।

১৯৯৩ সালে চীন সফর করেন শেখ হাসিনা।

১৯৯৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার সভায় গুলি ও বোমা হামলায় ৫০ জন আহত হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, খাগড়াছড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন

১৯৯৩ সালের জুন মাসে ভিয়েনার মানবাধিকারের ওপর দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের আগ মুহূর্তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এনজিও সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৯৯৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে। একই বছর টোকিওতে অনুষ্ঠিত সোশিয়ালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সেমিনারে যোগদান করেন তিনি। ১৯৯৪ সালে তিনি 'ইস্টার্ন ভিশন ফেয়ার'র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৯৪ সালের ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতার সূতিকাগার জাতির পিতার ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কের ঐতিহাসিক বাসভবনটি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে' রূপান্তর করে তা দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনার ট্রেন অভিযাত্রায় ঈশ্বরদী ও নাটোরে ব্যাপক সন্ত্রাস, গুলি, বোমা হামলা ও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। এ ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশসহ আহত হন শতাধিক। ১৯৯৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা মিন্টো রোডের বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবন ত্যাগ করেন। ১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি বিরোধী দলের সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন। তাঁর নেতৃত্বে খালেদা সরকারের ভোট কারচুপি ও জনগণের ভোটাধিকার হরণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে তীব্র আন্দোলন।

১৯৯৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিএনপি'র একদলীয় নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়ে খালেদা সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন প্রথমবারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৬-২০০১ পাঁচ বছর ছিল স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল সময়। এ সময়কালের মধ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়।

১৯৯৬ সালের ২রা অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর সংসদে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল করা হয়। ১৯৯৬ সালে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রথমবারের মতো 'ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত বিশ্ব মহাসম্মেলন'-এ কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন তিনি। ১৯৯৭ সালের ৬ ও ৭ই মে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা।

তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম 'বিমসটেক'-এ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ১৫ই জুলাই জার্মানির হামবুর্গে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান এবং সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৭ সালের ২৮শে অক্টোবর লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে 'ভোট কারচুপি ও সমাধান' প্রসঙ্গে ভাষণ দেন। তাঁর এই ভাষণ রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বিপুল প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামি ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন শেখ হাসিনা। এছাড়া ওই একই বছরে যুক্তরাজ্যের এডিনবরায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন, মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন তিনি।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবার ১৪ হাজারেরও বেশি নারী জনগণের সরাসরি ভোটে সদস্য ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৯৭ সালের ৪ঠা জুলাই জাপানের বিখ্যাত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করেন। সেই অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি এমন একটি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, যে দেশের জন্য আমার পিতা, আমাদের মহান নেতা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অশ্রুপাত করেছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন, ঢেলে দিয়েছেন বুকের রক্ত। ব্যক্তিগত সকল কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে আমি এখন আমার দেশের কোটি কোটি মানুষের সাথে

একই কণ্ঠে উচ্চারণ করি– আমাদের কাছে গণতন্ত্রের চেয়ে বড়ো কোনো আদর্শ নাই। গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো কোনো ভিত্তি নাই এবং আইনের শাসন ছাড়া স্বাধীনতার জন্য বড়ো কোনো গ্যারান্টি নাই'।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩৭তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে গণভবনে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

১৯৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে 'শান্তিবাহিনী' প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন। সেইসাথে ওই বাহিনীর প্রায় ২ হাজার সশস্ত্র সদস্যও গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্র সমর্পণ করে ফিরে যান স্বাভাবিক জীবনে।

১৯৯৮ সালে যমুনা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। প্রথম মুঠোফোন (মোবাইল) প্রযুক্তির বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং উল্লেখযোগ্য হারে কর সুবিধা প্রদান করা হয়। বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেল অপারেট করার অনুমতি প্রদান করে আকাশ সংস্কৃতিকে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। পিতার সাথে মাতার নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। কম্পিউটার আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসকরণের দ্বারা সাধারণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ অবারিত করে দেওয়া হয়।

১৯৯৮ সালের মে মাসে মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে ভারত ও পাকিস্তান উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ এশিয়া; তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এ উপমহাদেশ জুড়ে। সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমন ও পারমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতা থেকে তাদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত ও পাকিস্তানে ঝটিকা সফর করে উভয় দেশকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। শান্তির দূত শেখ হাসিনার এ সাহসী উদ্যোগকে বিশ্ব সম্প্রদায় স্বাগত জানান এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৪২ লাখ ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ১০ লাখ মানুষকে প্রায় ৯ মাস বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিঋণ আদায় এক বছর বন্ধ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্যিক শীর্ষ সম্মেলন।

১৯৯৯ সালের ১৫ই মে 'হেগ শান্তি সম্মেলনের শতবার্ষিকী' সমাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শেখ হাসিনা। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বাঙালি জাতির গর্ব ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

২০০০ সালে আফ্রো-এশিয়ান ল' ইয়ার্স ফেডারেশন প্রদত্ত 'পারসন অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন তিনি। ২০০০ সালে মুফতি হান্নান গং তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে কোটালিপাড়ায়। ২০০০ সালের ১০ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অভিষেক টেস্ট ম্যাচের উদ্‌বোধন করেন শেখ হাসিনা। ওইদিনই ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রথম এশীয় সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন তিনি।

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আবারো সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন। ২০০২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনি কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

২০০৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সিলভার জুবিলি সমাপন অনুষ্ঠানে 'সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড গুড গভর্ন্যান্স: দি জার্নালিস্ট রুল' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা।

২০০৪ সালে ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের হত্যার উদ্দেশে নারকীয় গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। ওই ঘটনায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন।

২০০৪ সালের ২৫শে অক্টোবর নিউইয়র্কের লার্গোডিয়া কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সর্বজনীন গণসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন শেখ হাসিনা। ২০০৪ সালের ২৮শে অক্টোবর নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে দি কাউন্সিল অব ওম্যান ওয়ার্ল্ড লিডার্স আয়োজিত 'শেপিং দ্য ফিউচার গ্লোবাল পলিসি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন শেখ হাসিনা। ২০০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল ম্যানিলায় অ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস আয়োজিত সিনিয়র অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সভায় যোগ দেন।

২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে বিএনপি-জামাতের নীলনকশার নির্বাচন বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বঘোষিত প্রধানের পদ থেকে ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগ। জরুরি অবস্থা ঘোষণা। ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে নতুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে মাইনাস টু ফর্মুলা দেওয়া হয় মহলবিশেষের ইঙ্গিতে। শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফরে গেলে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। শেখ হাসিনা সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রত্যয় ঘোষণা করলে ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ৭ই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। জরুরি আইনের বাধা উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ রাজপথে নেমে এসে তাঁকে স্বাগত জানায়। ২০০৭ সালের ৭ই মার্চ রাতে যৌথবাহিনীর একটি দল কোনো ধরনের সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই দুদফায় জননেত্রী শেখ হাসিনার সুধা সদনস্থ বাসভবনে প্রবেশ করে।

২০০৭ সালের ১৬ই জুলাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২০০৮ সালের ১১ই জুন প্যারোলে মুক্তি পেয়ে ১২ই জুন চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। চিকিৎসা শেষে স্বদেশে ফিরে আসেন তিনি। ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার উপস্থাপন করেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬৪টি আসন লাভ করে। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাধ্যমে জাতির কলঙ্কমুক্তি ও বিডিআর বিদ্রোহের শান্তিপূর্ণ সমাধান। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও বিশ্বমন্দা মোকাবিলা। দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা, কৃষিতে বিপুল ভরতুকি, ধানের বাম্পার ফলন, সর্বকালের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭ শতাংশে উন্নীত, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন। প্রতিবছর বিনামূল্যে বই প্রদান, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সফল পাবলিক পরীক্ষার পদ্ধতি প্রচলন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ, লোডশেডিং সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা, শিল্পকারখানায় নতুন করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ প্রদান শুরু, কর্মসংস্থান ও হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সম্প্রসারণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু, সফলভাবে ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান। ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের সূচনা, পর পর দুবছরে বাংলাদেশের দুই তরুণী ও এক তরুণের এভারেস্ট জয়, উন্নয়নশীল বিশ্বে বাংলাদেশেই প্রথম সোনালি আঁশ পাটের জিন প্রযুক্তির আবিষ্কার। সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার উন্মোচিত, বন্ধ পাটকল চালু, শিল্পায়নের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, গার্মেন্ট শ্রমিকদের পে-স্কেল পুনর্নির্ধারণ। সরকারি কমকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বর্ধিত বেতন স্কেল কার্যকর করা, শিল্প পুলিশবাহিনী গঠন, শিল্পে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, তিস্তা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন, রাজধানী ঢাকার একটি বিশেষ অংশে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন, ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে কুড়িল-বিশ্বরোড ফ্লাইওভার, মিরপুর-বনানী ফ্লাইওভার, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, মৌচাক-মগবাজার ফ্লাইওভারসহ একাধিক উড়াল সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও ফ্লাইওভার নির্মাণ, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি।

২০০৯ সালের ২৪শে জুলাই আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে ন্যামের ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ২০১০ সালে মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান অ্যান্ড স্যাশ বাংলাদেশকে 'সম্মুখের সারির বাজার' এবং 'একাদশ উদীয়মান' দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০১১ সালের ৩০শে জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। সংশোধনীতে '৭২-এর মূলনীতি পুনর্বহাল, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রথা চালু, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীদের জন্য ৫০ আসন সংরক্ষণ, দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্যসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০১২ সালের ১৪ই মার্চ মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলায় আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ইটলসের রায়ে বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের ২৮শে এপ্রিল সমুদ্র জয় উদ্‌যাপন নাগরিক কমিটি কর্তৃক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদান করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। ২০১২ সালের ১৯শে জুন ছোটো বোন শেখ রেহানাকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থ ও এর ইংরেজি সংস্করণ 'The Unfinished Memoires-এর মোড়ক উন্মোচন করেন শেখ হাসিনা। ২০১২ সালের ১০ই আগস্ট দেশের প্রথম ডিজিটাল কোরান শরিফ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১২ সালে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক 'কালচারাল ডাইভারসিটি পদক' লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১২ সালের ১৪ই অক্টোবর টেলিটকের থ্রিজি প্রযুক্তি উদ্‌বোধন করেন তিনি। ২০১২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সাধারণ অধিবেশনের সভায় ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া 'জনগণের ক্ষমতায়ন' এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাব পাস হয়। ২০১২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা।

২০১৩ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসাধারণের জন্য খুলে দেন স্বপ্নের কুড়িল ফ্লাইওভার। ২০১৩ সালের ১৮ই আগস্ট গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশি পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের ঘোষণা দেন তিনি। তাঁর সার্বিক সহায়তায় বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয় যুগান্তকারী এ সফলতা।

২০১৩ সালের ২রা অক্টোবর পাবনার ঈশ্বরদীতে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৩ সালের ২১শে নভেম্বর নির্বাচনকালীন সরকার 'সর্বদলীয় সরকার'-এর প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। ২০১৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামাত নেতা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়।

২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। ২০১৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি আর ঝাউবীথির বুক চিরে গড়ে তোলা শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৩ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ গড়ে লাখো কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড।

২৩শে এপ্রিলে আগামী তিন বছরের (২০১৫-১৭) জন্য জাতিসংঘের ইউনিসেফ এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ২৪শে মে চারদিনের জাপান সফরে যান তিনি। ২৫শে মে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের কার্যালয়ে শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশকে ৬০ হাজার কোটি ইয়েন (৬০০ কোটি ডলার) সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় জাপান। ৬ই জুন ছয়দিনের সফরে চীন গমন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৯ই জুন বেইজিংয়ে তাঁর সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেছিয়াংয়ের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সফরে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দুটি চুক্তি, দুটি সমঝোতা স্মারক এবং দুটি বিনিময়পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশে একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও চীনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ। ৭ই জুলাই নেদারল্যান্ডসের হেগের সালিসি আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ই জুলাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে রায়টি প্রকাশ করে। ২১শে জুলাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনের বিশেষ আমন্ত্রণে গার্ল সামিট-১৪-তে যোগ দিতে যুক্তরাজ্য গমন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সফরে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা সফররত জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সাথে গণভবনের শিমুল কনফারেন্স হলে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য আগামী পাঁচ বছরে ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল-২০১৪' জাতীয় সংসদে পাস হয়। প্রধান বিরোধী দল জাপাসহ অন্য বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে বিলের পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়ে কোনোরকম বিরোধিতা ছাড়াই বিভক্তি ভোটে নির্বিঘ্নে বিলটি পাস করে। ২১শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৬৯তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যে নিউইয়র্ক গমন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেন তিনি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৬৯তম সাধারণ অধিবেশন এবং ২৯তম বিশেষ অধিবেশনের ক্রেডেনশিয়াল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে।

২০১৫ সালের ৭ই মে ভারতে লোকসভায় পাসকৃত সীমান্ত চুক্তি বিল অনুযায়ী ২০১৬ সালের ৩০শে জুন বাংলাদেশের ভেতরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল এবং ভারতে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল বিনিময় করা হয় দেশরত্ন শেখ হাসিনার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। এত শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুটি দেশের মধ্যে এতগুলো ছিটমহল বিনিময়ের নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

১৪ই অক্টোবর ২০১৬ চীনের সাথে উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে সই করেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

৮ই এপ্রিল ২০১৭ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে হায়দরাবাদ হাউজের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রতিরক্ষা খাতে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তিসহ ২২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে আরো ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার ঘোষণাও এসেছে বৈঠক থেকে।

৫ই মে ২০১৭ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হলো দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট জিস্যাট-৯। ভারতের অন্দ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বিকেল ৪টা ৫৭ মিনিটে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এ উপলক্ষে ওইদিন সন্ধ্যায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ কানাডার মান্ট্রিয়েলে অনুষ্ঠিত ফিফথ গ্লোবাল ফান্ড রিপ্লেসমেন্ট কনফারেন্সের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় তিনি বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক তিন ব্যাধি– এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে একত্রে কাজ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এজন্য প্রয়োজন অঙ্গীকার, সংকল্প ও সংহতি। জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক সহযোগিতার তহবিল কামনা করেন।

দ্বিতীয়বার দায়িত্ব গ্রহণের পর বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছেন এবং একটি উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। চীন, ভুটান, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও সুইডেনে তাঁর সফর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখেছে। তিনি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতায় চীন ও মিয়ানমারকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর গৃহীত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে– বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করা, নতুন স্থলবন্দর খোলা এবং বিদ্যমান স্থলবন্দরগুলোর উন্নয়ন সাধন, পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সীমান্ত বাজার চালু করা, বাংলাদেশের আশুগঞ্জ ও ত্রিপুরার শিলাঘাটকে পোর্ট-অব-কল ঘোষণা, আখাউড়া-আগরতলা রেলসংযোগ প্রতিষ্ঠা, ভারত, নেপাল ও চীনকে বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিতে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর, বাংলাদেশ ও ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি, এবং বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামো ও নদীপথের উন্নয়নে ভারতের কাছ থেকে সহজ শর্তে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ প্রাপ্তি। আশা করা হচ্ছে, ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাপক লাভবান হবে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারেও আগ্রহ দেখিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক দেশের মাটিতে বিদেশি সন্ত্রাসীদের অবস্থানের ব্যাপারে শেখ হাসিনা সরকার 'জিরো-টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করেছে। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে এসকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে বাম ও ডান ঘেঁষা চরমপন্থিদের বিরুদ্ধেও নিরাপত্তা বাহিনী সর্বাত্মক অভিযান চালাচ্ছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শরৎ বালিকা

জাকির আবু জাফর

শরৎ বালিকা তুমি দাঁড়িয়েছ হৃদয়ের বাঁকে
দাঁড়িয়েছ একা তুমি নিভৃতির ভরা মাঠের শরীরে
আদিগন্ত তোমার আঁচল তোমার সফেদ পালক
তোমার কোমল হৃদয় শেফালির মুখ
রাতের নৈশব্দ যখন ঝরায় শিশির তোমার চোখ থেকে
উড়ে যায় জোনাকির দল
আহা কী মায়ার মৌনতায় বেঁধে রাখো রাত্রির শরীর
নক্ষত্রের চোখে চোখ রেখে সারারাত জ্বালাই তোমার জ্যোতি
মাঝে মাঝে ডেকে ওঠো নির্ঘুম কোনো পাখির ঠোঁটে
তোমার শিশিরে হৃদয় ভেজাই মন ভেজাই
ভেজাই স্বপ্নের সমস্ত চোখ এবং কল্পনার নুড়ি
মুখ ধুয়ে বকুলতলায় দাঁড়ালেই দেখি টুপটাপ ঝরো ঘাসের শরীরে
আমার চোখের বুকে তোমার কোমল সুখ ভোর হয়ে নামে
ভোরের চুম্বন আমার সমস্ত শরীরব্যাপী ছড়ায় রোদের পশম
হে শরৎ মেয়ে তোমার আঁচল টানো আমার সর্বত্রের সীমানায়
আমার দহনে বোলাও তোমার কোমল কুসুম
শরৎ বালিকা তোমার চোখের কোণায় জল
শুকিয়ে কখনো তুমি হয়ে ওঠো ক্ষীণকায়
মহানগরীর পথের বাঁকে বিশীর্ণ তুমি
ধোঁয়া, ধূলা আর বৈষম্যের বেদনায় তুমি কঙ্কালসার
কী যে বিষণ্নতায় ছেয়ে থাকে তোমার মুখ
চোখে চোখ রেখে কী করে দাঁড়াই তোমার মুখোমুখি
কী করে দেখি তোমার বেদনার দাগ
শরৎ বালিকা আমার এখানে এই হৃদয়াশ্রিত জীবনের জিম্মায় থাকো
এই দোঁয়াশ গন্ধের গৌরবে মাখো তোমার নিজস্ব নিদাগ বদন
আত্মার অধীনে আক্রান্ত থাকো প্রতিদিন
প্রতিদিন তোমার সম্ভ্রান্ত কাশবনে কূজন তোলো বাতাসে
নীলাভ্রতার নৈসর্গে ছড়াও তোমার উদাস
হে আমার শরৎ সুন্দর তোমার বিনয়ী বসনে
সকালগুলো মুগ্ধচিত্তে মাখে লজ্জার রং
দহন ভুলে সারা দুপুর কখনো মেঘের পোশাকে
কখনো নীলের শাড়ি কখনো উদম নির্জনতায় ফোটে
বিকেলগুলো একা হয়ে গেলে তুমি আঁচল পাতো সূর্যের রেলিঙে
তারপর পলাশের হৃদয়বাটা আকাশে খোলো সন্ধ্যার মুখ
তোমার চোখেই চোখ রেখে জ্বলে রাতের নক্ষত্রজ্যোতি
একাকীনি হে শরৎ মেয়ে
আমার বুকের দেশে ঢেলে দাও তোমার নহর
পৃথিবীর নদীগুলো ভরে দিক তোমার মুগ্ধ শিশির।

জন্মদিনে আপনাকে অভিনন্দন

কাজী সুফিয়া আখতার

আটত্রিশ বছর পরে
আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে
আপনার জয় পতাকা উড়ে।
কৃষক রহিমা, অপর্না মারমা
কাঙালিনী সরিফা, চুড়িওয়ালী সরমা
জেলে অখিল জলদাস বলে, 'ভালোবাসি
শেখের বেটিরে বড়ো ভালোবাসি'।
দীর্ঘ বছর পরে ছিঁড়েছি ঋণের ফাঁস
পরানে ছলকায় মুনিষ্যির বাঁচার আশ।
উদ্বাস্তু শরণার্থী রোহিঙ্গারা আইলো বানের লাহান
'মাদার অব হিউম্যানিটি 'দেখল সারা জাহান
আশ্রয় দিলেন তাদের পরম মমতায়
উপেক্ষা করে কটূক্তি 'অতি মানবিকতার'।
অসীম সাহসে উন্নয়নের উজ্জ্বল প্রদীপ হাতে
হেঁটে চলেন আপনি সাতশ নদীর পাড় ধরে
নির্ভীক প্রহরী
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈভবে ঋতু বাজায় সুরের লহরী।
শরতের সুনীল আকাশের প্রসন্ন বুকে
পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ কী ছবি আঁকে
গায়ক পাখি শিস দিয়ে উড়ে উড়ে লুকোচুরি খেলে
মনোরম মেঘের ফাঁকে!
মাতাল হাওয়ার স্পর্শে কাশফুল দোলে চরাচরে
শিউলির হাসিতে কী উল্লাসে
বান ডাকে বর্ষায় ভরা-জল নদীতে
বৈঠার টানে প্রাজ্ঞ মাঝির নৌকা চলে তরতরিয়ে।
বরণীয়, আজি প্রভাতে একাত্তরে রাখলেন পা
সুরভিত বর্ণিল ফুলে ভরে যায় কাননে কানন
শুভ জন্মদিনে আপনাকে অভিনন্দন।

প্রতীক্ষার ছয় বছর ২০২৪ সাল

উন্নয়নশীল বলয়ে বাংলাদেশ

মো. আজগর আলী

গোড়ার দিকের জীববিজ্ঞানীরা পাখি, জন্তু ও মাছের বিভিন্ন প্রজাতিকে খাঁচা, মাছের ঘর (অ্যাকোয়ারিয়াম) ও বাক্স (শো-কেস)–এ শ্রেণিভিত্তিক করেই তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা জীবন্ত প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে চর্চা করতে চাননি। কেন চাননি তা জানা যায়নি। তবে সামাজিক বিজ্ঞানগুলো বোধ হয় আজও এ পর্যায় থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসেনি। তাঁরা সমস্ত সামাজিক সমস্যাকে বিভিন্ন নামে ও বিশেষণে বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত অর্থের চাকার আবর্তে আষ্টেপৃষ্ঠে পুরে দিলেন। এ দৃষ্টিভঙ্গির নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্থসামাজিক উন্নয়ন'। এটি আবার একদল অর্থনীতিবিদের দ্বারা কতিপয় মৌলিক মানদণ্ডের আলোকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে তিনটি অর্থনৈতিক বলয় বা স্তরে যথা-স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

আর ১৭ই মার্চ বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার প্রাথমিক স্বীকৃতি পায়। ২২শে মার্চ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর 'লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি' (এলডিসি) থেকে, উন্নয়নশীল দেশের বলয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে। দিনটি ছিল সুন্দর। নানা আয়োজন-বর্ণিল শোভাযাত্রা, উন্নয়নের বিভিন্ন স্লোগান লেখা নানা রঙের পোস্টার, ব্যানার-ফেস্টুন, টি-শার্ট পরিহিত জনতার ভীড় আর মনোরম আতশবাজি, লেজার শো ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব কিছু মিলে ছিল এক খুশির আমেজ। প্রতিটি অর্জন এবং পার্বণকে আমরা এভাবেই বরণ করি। সুন্দরকে নিয়ে আমরা প্রশস্তি রচনা করি। শুনতে ভালো লাগে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ভাবতেও অবাক লাগে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখন আর আগের মতো ছন, খড় ও গোলপাতার ছাউনি দিয়ে বাসগৃহ তৈরি হয় না। সে জায়গায় তৈরি হচ্ছে টিনের বা আধা পাকা ঘর। এদেশের মানুষের খোলা জায়গায়-যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ ও কাঁচা পায়খানা (নন-সেনেটারি) ব্যবহার করার অভ্যাস এখন আর দেখাই যায় না। খাবার পানির জন্য ট্যাপ এবং নলকূপের ব্যবহার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে। কেরোসিন ব্যবহৃত কুপি বা হারিকেনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সে সাথে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহারও আশাতীত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওসব দেখতে কার না ভালো লাগে! নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এগুলো খুশির এক পশলা চমক বৈকি!

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ

বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় 'মফস্বল' কথাটি খুবই পরিচিত। প্রায় দু'শতাব্দীরও আগে থেকে এ নামটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নামটির উৎপত্তি হয় ব্রিটিশ আমলে। যদিও সে সময় 'মফস্বল' কথাটি বড়ো শহরের পরিবর্তে ছোটো শহরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। সে নাম যাহোক না কেন আমরা যারা 'মফস্বল' থেকে ঢাকায় এসেছি তারা দেখেছি চার দশক আগে ঢাকায় আজকের মতো বহুতল আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবন ছিল না। মতিঝিলে যে দু-চারটি সুউচ্চ বাণিজ্যিক ভবন ছিল বর্তমানে তার চেয়ে বেশি উঁচু অট্টালিকা আমার 'মফস্বল' শহরে নির্মিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের আবাসন শিল্প এবং শহরগুলোর সম্প্রসারণ অত্যন্ত উলম্ব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে কলকারখানা, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প। শ্রমের প্রকৃতি ও বাজার দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। বেড়েছে শ্রমিকের মজুরি। পরিবর্তন এসেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। ভোক্তার খরচের সাথে সমান তালে এগুচ্ছে দেশের রন্ধন শিল্প। রেস্টুরেন্ট সেক্টরসহ পর্যটন শিল্পও দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান ছিল শতকরা ৭.২৮ ভাগ। বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ৩২.৪৮ শতাংশ। শিল্পায়ন তরান্বিত হবার ফলে দেশের রপ্তানি আয়ও বেড়ে যাচ্ছে। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যে শিল্পটি দেশের অর্থনীতির চাকাকে গগনচুম্বী করে স্বকীয়তা বজায় রেখে দুর্বার গতিতে বেগবান সে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প– যা বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশ দেশের জন্য আয় করছে। দেশে গত এক দশকে অর্থনৈতিক (ক্ষুদ্র) ইউনিটসমূহের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থনৈতিক ইউনিটসমূহের সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে ৭৮ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশে অকৃষিমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কর্ম লাভের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।

বাস্তবায়নের পথে স্বপ্নের পদ্মাসেতু

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

এ খাতে কর্ম লাভের পরিমাণ ২০১৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৫০ জন। মোট জাতীয় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছরই ৬% -এর অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ তে ৭.৬-এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৮৮ মার্কিন ডলার, ১৯৮২-৮৩ সালে ১৮৯ ডলার, ১৯৯২-৯৩ সালে ২৮৫ ডলার, ২০০২-০৩ সালে ৪৭১ ডলার, ২০১২-১৩ সালে ১০৫৪ এবং ২০১৭-১৮ সালে ১৭৫২ ডলার-এ উন্নীত হয়েছে। অন্যান্য সামাজিক সূচকেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশ থেকে অনেক অগ্রগামী। যেখানে ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮%, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৪.৩%-এ পৌঁছেছে। অতি দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালে ছিল ৩৪.৫%, যা ২০১৬ সালে কমে ১২.৯% হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। ২০১২ সালে প্রতি হাজার জীবিত শিশু পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৪২, যা ২০১৬ সালে কমে ৩৫-এ পৌঁছেছে। ২০১২ সালে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত ছিল ২.০৩, যা ২০১৬ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১.৭৮।

অন্যদিকে দেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২০১২ সালের ৬৪.৯ বছর থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ৭১.৬ বছর হয়েছে। কৃষি খাতে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেশে মোট খাদ্য উৎপাদন বিগত ৪৫ বছরে বেড়ে ৩৪৭.১ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্ববাজারে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় ও মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম স্থান লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশ তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথম এলডিসি থেকে বের হবার যোগ্যতা পূরণ করেছে। এখানেই গল্পের শেষ নয়। জাতির ইতিহাসে এটি একটি প্রধান মাইলফলক হলেও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলো আগামী দিনগুলোতে আরো জোরালো হবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিও পালটে যেতে পারে। তাই আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেতে আরো ছয় বছর অপেক্ষা করতে হবে। কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর প্রস্তাবের আলোকে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ দ্বারা প্রতি তিন বছরে এলডিসি তালিকাটি পর্যালোচনা করা হয়। চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত হবে ২০২১ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা দেওয়ার মাধ্যমে। এজন্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। উন্নত দেশগুলোর সমান স্তরে পৌঁছতে হলে আমাদের আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা আত্মনির্ভরশীল স্তরে উন্নীত হবার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। সব ধরনের শিল্পের বিকাশ করতে হবে। দেশের আমদানি বাণিজ্য হ্রাস করে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করতে

পাবনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

হবে এবং সেইসাথে লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূলে রাখতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির দৈত্যকে ঠিকমতো লাগাম টেনে ধরতে হবে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়ের স্বার্থে দাম-দস্তুর স্থিতিশীল হতে হবে। সুলভ মুদ্রানীতি গ্রহণ করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি, যোগাযোগ, কর্মমুখী শিক্ষা, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ভারী শিল্পের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

মেট্রোরেলের মডেল

আমাদের উচিত এমন এক বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। সর্বশেষে এটা অনুধাবন করতে হবে যে, পৃথিবীতে যেমন দিন-রাত্রি উভয়ই আছে, লাভের সাথে লোকসান, সুখের সাথে দুঃখ বিদ্যমান, তেমনই উন্নয়নের সাথে বাধা ও প্রতিরোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির চিন্তা করলে ভুল হবে। জনস্বার্থ রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সচেতন নীতির প্রয়োজন রয়েছে। সরকারকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হতে হবে। একক পক্ষে এ কাজ অসম্ভব। তাই সকলে মিলে সব বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে দলমতনির্বিশেষে জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে। আমরা তাকিয়ে আছি সেই সময়ের দিকে যখন প্রতীক্ষার যবনিকায় চূড়ান্ত ফলাবর্তে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সগৌরবে উন্নয়নশীল বলয়ে ছবি আঁকবে আগামীর বাংলাদেশ। এ প্রত্যাশা সকলের।

লেখক: গবেষক ও কলামিস্ট

হারিয়ে যাওয়া মনীষা

মহম্মদ এছহাক: জীবন ও সাহিত্য

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলা গদ্য সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান বিষয়ে খুব কম গবেষণাই হয়েছে। উনিশ শতকে গদ্যের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা কেমন গদ্য লিখেছেন, তার সবটাই আবিষ্কৃত হয়নি। এখনো অনেক পত্রপত্রিকা ও বইপত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে উনিশ শতক ও বিশ শতকের মুসলিম লেখকদের রচনাবলি, যার অনেকটাই সংগৃহীত হয়নি।

মহম্মদ এছহাক বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে এমনই একজন লেখক যাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* [সাহিত্য সংঘ সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৪ সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ] ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান* [পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭] দুটো অভিধানই খুঁজে দেখা হয়েছে, সেখানে মহম্মদ এছহাক নামে কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচয় লিপিবদ্ধ নেই।

অথচ মহম্মদ এছহাক ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম লেখক ও দার্শনিক, যাঁর লেখনি বিশ শতকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একাধারে সাধারণ প্রবন্ধ, দার্শনিক ভাষা, গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন, যাতে গভীর মননশীলতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু বাঙালি মুসলিমদের তালিকায় তাঁকে অনুপস্থিত দেখি। তাঁর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজনরা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছেন, এমনরাও তাঁকে নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি।

এরমধ্যে একজন প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [পরে মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি], তিনি সম্পর্কে মহম্মদ এছহাকের ভাগ্নে হতেন। তাঁর আমলে বাংলা একাডেমি থেকে চরিতাভিধান প্রকল্প হয়েছে, কিন্তু মহম্মদ এছহাক সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাননি, দেখালে হয়ত মহম্মদ এছহাক সম্বন্ধে একটি 'এন্ট্রি' চরিতাভিধানে ঢুকতে পারত।

অন্য একজন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক-গবেষক আলী আকবর টাবী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনাতেই মহম্মদ এছহাকের বিভিন্ন লেখা সংগৃহীত হয়েছে, যা এখানে সংকলিত হয়েছে। লেখাগুলোর মুদ্রাকার করার আগে লেখকের পরিচয়নামা সামান্য জেনে নিলে ভালো হয়।

মহম্মদ এছহাক বি.এ ১৯০১ সালে (এটা আনুমানিক ধরা হয়েছে। কেউ কেউ এটা ১৯০০ সালেও হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন।) পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। (পূর্বকালে শিক্ষিত লোকেরা বিএ, এমএ এভাবেই তাঁদের নাম লিখতেন, এতে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ পেত)। পাবনার বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক-রাজনীতিক রণেশ মৈত্র জানিয়েছেন, মহম্মদ এছহাকের গ্রামের নাম ছিল লক্ষ্মীপুর। [সূত্র: রণেশ মৈত্র 'পাবনা জেলার লক্ষ্মীপুর: একটি আতঙ্কিত জনপদ', আজকের কাগজ, ঢাকা, ৮ই নভেম্বর ২০০০ খ্রি.]। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইসমাইল প্রামাণিক। কিন্তু জন্মগ্রহণের দিনই তাঁর মা মারা যান। ফলে এ অবস্থাতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাতুলালয়ে। গ্রামের নাম শ্রীপুর। মামাদের এ গ্রামেই তিনি বেড়ে ওঠেন। মামা তাঁকে পুত্রস্নেহে লালনপালন করেন। পাবনা জেলা স্কুলে তাঁর কৈশোরের লেখাপড়া। এখান থেকেই মেট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে রাজশাহী সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিএ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

গ্র্যাজুয়েট হয়ে অন্যরা যখন কলকাতায় ছোটেন, তখন তিনি শুরু করেন শিক্ষকতা। তৎকালীন যশোরের বনগ্রাম ইংরেজি উচ্চ

বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। [সূত্র: মোস্তফা আবুল কালাম, পাবনা জিলা স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক-এর পত্র। পত্রটি এ গ্রন্থের সম্পাদক আলী আকবর টাবীর কাছে লেখা]। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর তিনি ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। এরপর আতাইকুলা উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তবে এখানে তাঁর বেশিদিন কাটেনি।

তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন একজন দার্শনিক। তাঁর দর্শন-ভাবনা এ সময় থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকীতে। তাঁর লেখক-মানসের স্বীকৃতিও মেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে তাঁর লেখা 'মানুষ' নামের একটি প্রবন্ধ স্থান পায়।

তাঁর লেখা *মনের খোরাক* নামে একটি গ্রন্থের সন্ধান মেলে। তিনি পত্রপত্রিকায় লিখেছেন প্রচুর। তাঁর অনুবাদ কর্মেরও সন্ধান পাওয়া যায়। টলস্টয়ের বিখ্যাত 'The coffee House at Surat' নামক দার্শনিক গল্প 'সুরাটের কাফিখানা' নামে তাঁর অনুবাদে বাংলাভাষীদের কাছে সেই উনিশ শতকেই পৌঁছে যায়। তিনি যে নিয়মিত লিখতেন এবং অতি উচ্চ বিষয়ক দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতেন, তা শুধু সে যুগের মুসলিম লেখক কেন, যে-কোনো বাংলাভাষী লেখকদের মধ্যেও ছিল বিরল।

তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ খুব একটা পাওয়া যায় না। ২০০০ সালে সাংবাদিক-সাহিত্যিক রণেশ মৈত্র জাতীয় দৈনিকে কলাম লিখতে গিয়ে অন্য একটি প্রসঙ্গে এনেছিলেন মহম্মদ এছহাকের কথা:

> লক্ষ্মীপুর এককালে পাবনা জেলার অন্যতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলে পরিচিত ছিলো। লক্ষ্মীপুর থেকে ৪/৫ মাইল উত্তরে সাঁথিয়া থানাধীন ভুলবাড়িয়া গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ি ছিলো। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি আতাইকুলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আজও মনে পড়ে প্রয়াত ইসহাক সাহেবের কথা। তাঁর বাড়ি ছিলো এই লক্ষ্মীপুর গ্রামে। ইসহাক সাহেব আমার পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আতাইকুলা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত শিক্ষক-গ্রাজুয়েট যা তখনকার দিনে (চল্লিশের দশকে) ছিলো বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পড়াতেন ইংরেজি আর ইতিহাস। এমন শিক্ষক দুর্লভ– আজকের দিনে তো বোধ হয় একটিও পাওয়া যাবে না কোথাও আমাদের দেশে। তাঁর ছাত্র বলে আমি এখনও মনে মনে প্রচণ্ড গর্ব অনুভব করি। [রণেশ মৈত্র: 'পাবনা জেলার লক্ষ্মীপুর: একটি আতঙ্কিত জনপদ' আজকের কাগজ, ঢাকা, ৮ই নভেম্বর ২০০০ খ্রি.]।

গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে রণেশ মৈত্র-র মতো ছাত্র তিনি গড়ে তুলেছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিবেক হিসেবে কাজ করেছেন। এরকম হয়ত আরো অনেক বিশিষ্ট ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে, যাঁরা লালিত হয়েছিলেন সরাসরি মহম্মদ এছহাকের মনীষার ঔজ্জ্বল্যে।

মহম্মদ এছহাক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করলেও *পুষ্পপাত্র* নামে একটি সাময়িকীরই সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখানে দুটো ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় তাঁর দুটো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটো সংখ্যায় লেখক হিসেবে গজেন্দ্র কুমার মিত্র, বিমল মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, সরোজিনী নাইডু, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখের লেখাও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার তথ্য পুরোপুরি পাওয়া যায় না। তাঁর রচনাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা (যা পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে) নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রম	প্রবন্ধ-গল্পের নাম	প্রকাশনার নাম	প্রকাশের তারিখ
১.	সুরাটের কাফিখানা [অনুবাদ]	পুষ্পপাত্র [চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা]	শ্রাবণ ১৩৩৭ [১৯৩০]
২.	মৃত্যু ও জীবাত্মা [দার্শনিক প্রবন্ধ]	পুষ্পপাত্র [চতুর্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]	ফাল্গুন ১৩৩৭ [১৯৩০]
৩.	অন্তর্য্যামী [খণ্ডাংশ]	মনের খোরাক নামে প্রকাশিত এক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত	প্রকাশনার তারিখের পাতা নেই
৪.	সুখ বনাম দুঃখ	ঐ	ঐ
৫.	মৃত্যু ও জীবাত্মা	ঐ [পুষ্পপাত্র সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত]	ঐ
৬.	অদৃষ্ট	মনের খোরাক নামে প্রকাশিত এক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত	ঐ ঐ
৭.	মানুষ	ঐ	ঐ
৮.	স্বপ্ন রহস্য	ঐ	ঐ
৯.	গ্রহান্তরে জীব [খণ্ডিত]	ঐ	ঐ

এই প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধগুলোর আলোকে মহম্মদ এছহাকের দর্শন-চেতনা সামান্য পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে উনিশ শতকে এক নীরব মুসলিম দার্শনিকের চিন্তার জগৎ সম্পর্কেও আমরা বিশেষভাবে জানতে পারব। প্রথমে 'সুরাটের কাফিখানা' নামক দার্শনিক গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। এটি তাঁর কোনো মৌলিক রচনা নয়, রুশ লেখক-চিন্তাবিদ টলস্টয়ের একটি রচনার অনুবাদ। রচনাটি থেকে ধর্ম-দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। টলস্টয়ের সব গল্পে যেমনটা হয়, গল্পের ছলে নীতিশিক্ষা বা অন্য কোনো আদর্শবাদিতা শিক্ষা দেওয়া– এখানের রচনাটিতেও এর ব্যত্যয় নেই। গল্পটির শুরু এমন,

> কোন এক সময়ে সুরাট সহরে একটী কাফিখানা ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় লোক ও পরিব্রাজকগণ সেই স্থানে সমবেত হইয়া বাক্যালাপ করিত। [মহম্মদ এছহাক: সুরাটের কাফিখানা, *পুষ্পপাত্র* সাময়িকী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রি.), পৃষ্ঠা ৪২৫]।

এদিনের 'বাক্যালাপ'-এর প্রধান বিষয় ছিল কার ধর্ম বা কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ। তবে শুরুটা এক নাস্তিককে দিয়ে, যে মনে করত 'বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের মূলে কোনো উচ্চতর জ্ঞান নাই'। নাস্তিক পারস্য দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এসেছিল। তাঁর ভৃত্য নাস্তিক ছিল না, তবে সে লুকিয়ে কাঠের একটি পুতুলকে ঈশ্বর মনে করত, সে কাঠের পুতুলটি কটিবন্ধ থেকে বের করে দেখালো। কাফিখানায় অনেক ধর্মের লোক জড়ো হয়েছিল। ভারত থেকে আগত একজন ব্রাহ্মণও ছিল। সে দাবি করল যে, ব্রাহ্মণরাই 'প্রকৃত ঈশ্বরের তত্ত্ব জানেন; অন্য কেহ নহে'। উপস্থিত একজন 'ইহুদী দালাল' ব্রাহ্মণের কথার প্রতিবাদ করে বলল, ঈশ্বর 'ইস্রাইল' ব্যতীত অন্য কাউকেই রক্ষা করেন না। ইতালি থেকে একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান যাজক ইহুদির কথার প্রতিবাদ করে জানালো যে, ঈশ্বর একমাত্র রোম নগরের 'ক্যাথলিক গীর্জা'তেই মানুষের মুক্তির জন্য আহ্বান করে থাকেন। সেখানে একজন প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানও উপস্থিত ছিল, সে বলল, ঈশ্বর একমাত্র 'গস্‌পেল প্রদর্শিত পন্থা' অবলম্বনকারীকেই রক্ষা করবেন। কাফিখানার মুসলিম কর্মচারী এসময় বলে উঠল, মহম্মদ প্রচারিত ধর্মই সত্য ধর্ম। সেখানে নাস্তিকরা যেমন উপস্থিত ছিল, তেমনই অগ্নি উপাসকরাও ছিল। তবে আলোচনার এক পর্যায়ে চীনের কনফিউসাসের শিষ্য একটি অভিমত প্রকাশ করল, তা এই যে, প্রত্যেক মানুষই তার নিজের জন্য অথবা অন্তত তার জন্মভূমির জন্য একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর চায়।

টলস্টয় ধর্ম নিয়ে মানুষের বাড়াবাড়ি, একের প্রতি অন্যের

অহমিকার অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছিলেন। মহম্মদ এছহাকের অনুবাদে বাঙালি পাঠক সেই ১৯৩০-এর সময়েই প্রাঞ্জলভাবে তা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিল। মহম্মদ এছহাক ধর্মবাদী দার্শনিক, কিন্তু টলস্টয়ের এ গল্প অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর উদারবাদী মন ও চিন্তাশীলতার বৈচিত্র্য লক্ষ করি। তিনি নিজে যেসব দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানেও তাঁর এ মননশীলতার ব্যত্যয় ঘটেনি। যেমন, 'অন্তর্য্যামী' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> মানুষ সর্বজ্ঞানের অধিকারী হইবার যোগ্য নয়। অনেক বিষয় আছে, যাহা তাহাকে মানিয়া লইতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়। সৃষ্টিকর্ত্তাকে আমাদের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়া অবাধে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করা কিংবা তাঁহার সন্ধান জানিয়া রাখা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয় নাই...। তিনি অনন্ত অসীম, অচিন্তনীয়। তিনি আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র মস্তকে আবদ্ধ হইবেন কেন? [মহম্মদ এছহাক: 'অন্তর্য্যামী', *মনের খোরাক* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, প্রকাশনার তথ্য নেই (খণ্ডিত গ্রন্থ)]।

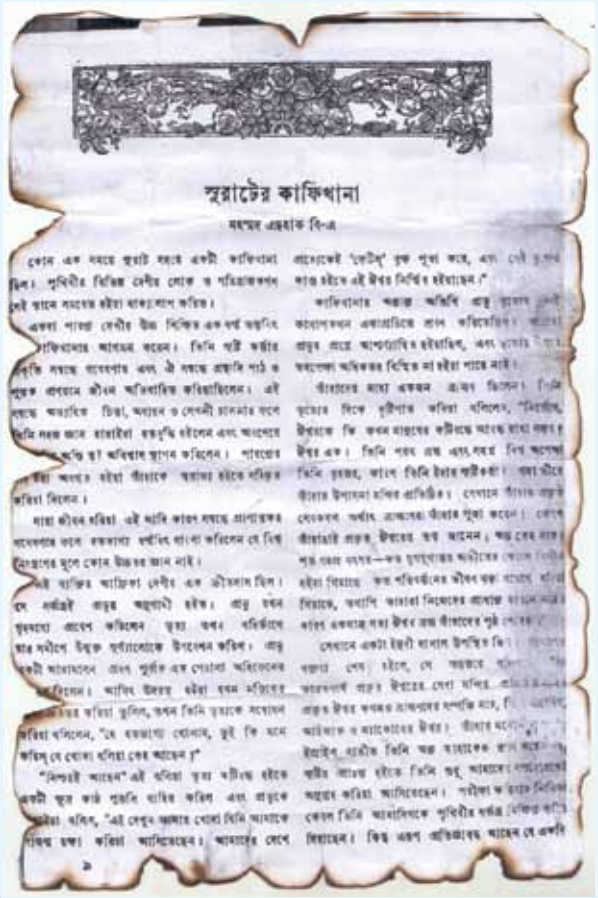
সুরাটের কাফিখানা
মহম্মদ এছহাক বি-এ

মানুষের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি অন্যত্র লিখেছেন,

> মানুষের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। অধিকন্তু আমরা যে-জ্ঞান লইয়া বড়াই করি, তার কতখানি যে অজ্ঞানতার বাষ্পে আচ্ছন্ন, সেটাও চিন্তার বিষয়। ['সুখ বনাম দুঃখ', পূর্বোক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধ]।

মানুষের সুখ-দুঃখ চিন্তা নিয়ে তাঁর মন্তব্য,

> দুঃখ না থাকিলে জগতে সুখ বলিয়া একটা কিছু থাকিতে পারিত না; থাকিলেও একঘেয়ে সুখে মানুষ হাঁপাইয়া উঠিত এবং সে সুখের সুখত্ব থাকিত না।

উপমা টেনে তিনি তা বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'অমাবস্যা আছে বলিয়াই পূর্ণিমা রাত্রি এত মধুর! যদি প্রত্যেক রাত্রিই পূর্ণিমার রাত্রি হইত, তবে পূর্ণিমা-রজনীর কোনো বিশেষত্ব, তথা গৌরবই থাকিত না'।

মৃত্যু কী, এ প্রশ্নেরও একটি দার্শনিক উত্তর তিনি দেন,

> মৃত্যু জীবনের শেষ নয়–নবজীবনের প্রবেশদ্বার এবং মৃত্যু যদি জীবনের পূর্ণচ্ছেদ না হয়, ইহা যদি অন্য উজ্জ্বল মধুর জীবনের সিংহদ্বার হয়, তবে ঐশ্বরিক ন্যায়পরায়নতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছুই থাকে না। ['সুখ বনাম দুঃখ', পূর্বোক্ত]।

পাপ ও পাপী এবং সাধু-সজ্জন সম্পর্কে তাঁর দর্শনটিও স্মর্তব্য:

> তৈলের সঙ্গে জলের যে সম্পর্ক, পাপীর অন্তরের সহিত প্রকৃত আনন্দেরও তাহাই। পাপ অনুষ্ঠান তাহাকে এক উদ্ভট চঞ্চলতায় মাতাইয়া রাখে–প্রকৃত সুখ সে পায় না। ['সুখ বনাম দুঃখ', পূর্বোক্ত]।

তেমনি আস্তিক-নাস্তিক বিষয়টিও তাঁর দর্শনশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অভ্রান্ত:

> বিশ্বের উদ্ভাবন ও নিয়ন্ত্রণের মূলে যে কোন উচ্চতর জ্ঞান বিরাজ করিতেছে, তাহা নাস্তিক বিশ্বাস করেন না।... শুধু নাস্তিক কেন, অনেক আস্তিকও মুখে আত্মা ও সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস তেমন দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন নয়। ['মৃত্যু ও জীবাত্মা', পূর্বোক্ত *মনের খোরাক* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ]।

মহম্মদ এছহাক চিন্তাবিদ হিসেবে ধর্মবাদী দার্শনিক হলেও ধর্ম বিষয়ে তাঁর মধ্যে একটা উদারতা লক্ষ করি। তিনি যে লিখেছেন, 'পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সবই আত্মার অমরত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রবর্তন করেন, তাঁহারা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। মর্ত্ত্যবাসী কোটী কোটী নরনারীর হিতকল্পে স্বয়ং স্রষ্টা কর্ত্তৃক তাঁহারা প্রেরিত'–তাতে তিনি সব ধর্মকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মহম্মদ এছহাক তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে 'অদৃষ্ট' বিষয়টিকেও টেনে এনেছেন। 'অদৃষ্ট' সম্পর্কে তাঁর ধারণা, 'সমাধান হউক বা না হউক, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অদৃষ্টে আস্থাবান এবং বিধিলিপি, ভাগ্যচক্র, নিয়তি, তক্‌দির, ডেষ্টিনী প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এই একই শক্তিকে নির্দ্দেশ করে সুতরাং ইহাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না'। ['অদৃষ্ট': পূর্বোক্ত *মনের খোরাক* গ্রন্থের প্রবন্ধ]।

কাজ বা কার্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'মানুষ যে কার্য্য করে, পূর্ব্বের সে বিষয়ে সে চিন্তা করিয়া লয়।... মানুষের প্রত্যেক কার্য্য এইরূপ– পূর্ব্বে চিন্তা, পরে কাজ। মোটের উপর চিন্তা কার্য্যে রূপ পায়'। [অদৃষ্ট, পূর্বোক্ত]। তাই তিনি সমাধান কাটেন, 'যত বুদ্ধি সহকারে আমাদের এই দুর্ব্বোধ্য জীবন পরিচালনা করি না কেন, অদৃষ্টে যা থাকে, শুধু তাই হয়'।

মানুষ ও মানুষের বিবর্তন নিয়ে দুনিয়া জোড়া যুগে যুগেই বিতর্ক ও আলোচনা চলছে, এটা চলতেই থাকবে। মহম্মদ এছহাক আস্তিক্যবাদী দার্শনিক, কিন্তু মানুষের বিবর্তনে ডারউইন তত্ত্বকে তিনি আমলে নিচ্ছেন,

> ... ডারউইন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ বানর। ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী বানর ক্রমোন্নত হইয়া শেষে মানবত্বে প্রমোশন পাইয়াছে। একথা অতিরঞ্জিত বলিয়াও মনে হয় না। লেজের কথা বাদ দিলেও মানুষের আকৃতি যে অনেকটা মর্কটের মত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ['মানুষ', *মনের খোরাক* গ্রন্থের প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত]।

তাঁর রচিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে মানুষ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। এজন্য মানুষ সম্পর্কিত তাঁর দার্শনিক

মন্তব্যগুলো প্রবাদতম মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। তিনি বলছেন,

১. ... মানুষ দেবতা নয়, কেননা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষও দোষ-ত্রুটি বর্জ্জিত নন। 'মানুষ', *মনের খোরাক* গ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪]।

২. ... মানুষ পশুও নয়। পশু প্রবৃত্তির বশে অন্ধভাবে কার্য্য করে। ['মানুষ', পূর্বোক্ত]।

৩. মানুষের বিচার বুদ্ধি আছে– কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সে তার ভাবীফল চিন্তা করে। ['মানুষ', পূর্বোক্ত]।

৪. মানুষ বিবেকসম্পন্ন জীব, সুতরাং সে সুকার্য্য করিয়া সুখী ও কুকার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হয়।

৫. পশুর জীবন-প্রণালী কোটী বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও প্রায় সেই রূপই আছে, কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জ্ঞান বিভব ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

৬. ... মানুষের মধ্যকার সেই আদিযুগের পশু এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই– কখনও যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই।

৭. প্রবৃত্তি মানুষকে চালনা করে, কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির পশু। মানুষে ও পশুতে পার্থক্যই এইখানে।

৮. সকলেই যদি প্রকৃত মানুষের ধর্ম্ম পালন করিতে পারিত তাহা হইলে 'নরপশু', 'নরপিশাচ' প্রভৃতি শব্দগুলির সৃষ্টি হইত না।

৯. মানব চরিত্রের উপর সঙ্গের প্রভাব খুবই প্রবল। মানব সামাজিক জীব। অবস্থাগতিকে যে যেরূপ সঙ্গ লাভ করে তাহার চরিত্র সেইরূপই হইয়া উঠে।

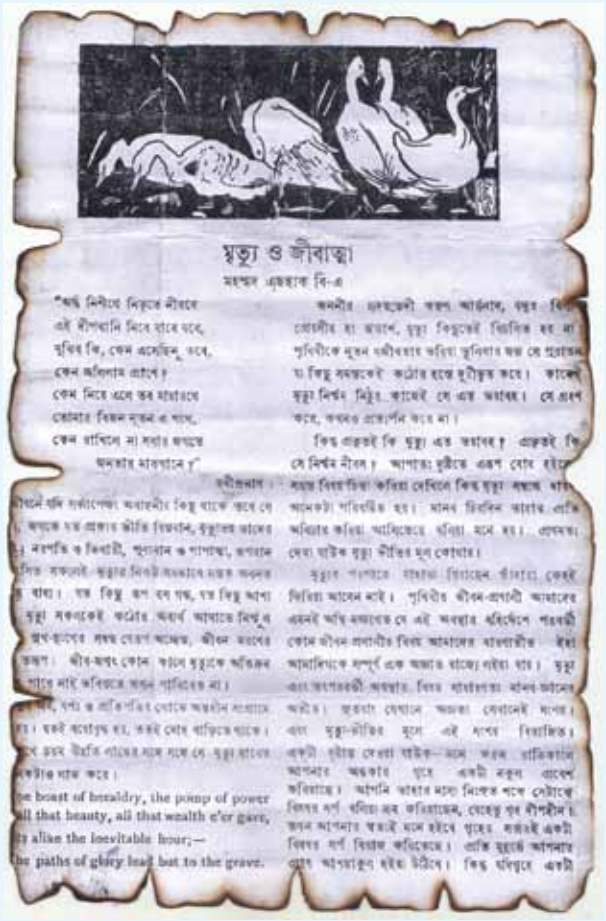
মৃত্যু ও জীবাত্মা

১০. ... মানুষ মানুষের শত্রু হিসাবে যতখানি প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, বাঘ ভালুক প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তু তা কখনও পারে না।

১১. ... মানুষের প্রতি মানুষের কেমন যেন একটা রক্তের টান আছে এবং সেইটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। ['মানুষ', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫২-৬২]।

মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর এই দার্শনিক উপলব্ধি আমাদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। তিনি তাঁর সময়ের এক বিরল প্রতিভা, যা লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেছে। 'স্বপ্ন রহস্য' নিয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে, সেখানেও আমরা তাঁর এই দার্শনিক প্রতিভার প্রকাশ দেখি। প্রথমেই তিনি বলে নেন, 'স্বপ্ন দেখে নাই, এরূপ লোক সমস্ত পৃথিবীতে একজনও আছে কি-না সন্দেহ। যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটে, তখন আমরা বলিয়া থাকি, এরূপ ব্যাপার স্বপ্নাতীত'। এরপর স্বপ্নের একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপন করেন,

> ... আমরা অনেক সময় অনিচ্ছাকৃত চিন্তা ও কার্য্য করিতে বাধ্য হই। কতকটা সেতারের তারের মত ব্যাপার আর কি! তিনবার টোকা দিলে তেত্রিশবার নড়ে। মস্তিষ্কের এ শক্তিটা নিদ্রিতাবস্থাতেই সমধিক প্রবল হয়। সুতরাং দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে-সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, মস্তিষ্কের স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম্মশীলতা... হেতু, নিদ্রিতাবস্থায় কতকটা তাহারই পুনরাভিনয় হয় এবং আমরা বিভোর হইয়া স্বপ্ন দেখি। [স্বপ্ন-রহস্য, *মনের খোরাক* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫]।

তাঁর অলংকৃত এ বাক্যে স্বপ্নের একটা তাত্ত্বিক ভিত্ দাঁড়িয়ে যায়। তাঁর জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ, সে খুব কমই স্বপ্ন দেখে'। অন্যদিকে 'অসুস্থ ব্যক্তির নিদ্রা স্বপ্নবহুল হয়'। যে-কোনো মনোবিজ্ঞানীও তাঁর এই মন্তব্যকে ফেলে দিতে পারবেন না।

এরপর তিনি স্বপ্নের কতকগুলো কার্যকর ফলাফল পাঠকের সামনে তুলে ধরেন:

১. জাগ্রত মানুষের দ্বারা যে-সমস্ত কার্য্য অসম্ভব, নিদ্রিত মানুষের নিকট তাহা অনায়াস-সাধ্য।

২. জাগ্রত-অবস্থায় যে প্রশ্নের সমাধান হইল না, নিদ্রিতাবস্থায় অনেক সময় তাহার সুচারু সমাধান হইয়া গেল।

৩. জাগ্রতে শত চেষ্টাতেও যে কথা স্মরণ হইল না, নিদ্রায় সহসা সে কথা মনে পড়িয়া গেল...।

৪. স্বপ্নে অনেকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর এই তত্ত্ব, তথ্য ও আবিষ্কার পাঠক হিসেবে আমাদের আপ্লুত করে। তিনি তাঁর স্বকালে এমন এক মনীষার অধিকারী ছিলেন যাঁকে তাঁর কাল সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। যদি পারত তাহলে তাঁর দর্শন, তাঁর সত্যগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হতো, যেমনটা এরচেয়েও সামান্য অনেক প্রতিভার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। তিনি বিশ শতকের এমন এক পণ্ডিত ও দার্শনিক যাঁর মূল্যায়ন অপেক্ষিত। জাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মহম্মদ এছহাকের মূল্যায়নে আগ্রহী হবেন এবং তাঁর দর্শন-চেতনার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্ব দেবেন, এটা এখন একুশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের দাবি। আশা করি, বর্তমান প্রজন্ম তাঁর চিন্তা-চেতনাগুলো থেকে সমৃদ্ধ হবে। উনিশ শত ত্রিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন তাঁর 'মানুষ' নামক প্রবন্ধটি মেট্রিকুলেশন শ্রেণিতে পাঠ্য করেছিল, বর্তমান সময়েও পাঠ্যসূচিতে এসএসসি বা এইচএসসি-তে তাঁর এ লেখাটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

লেখক: লেখক ও গবেষক

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও আমাদের করণীয়

একরাম উদ্দীন সুমন

আজকের আধুনিক দুনিয়াতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হলেও বিশ্বের অনেক মানুষ আজও শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি নিজের পরিচয়ও লিখতে পারে না লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের সাক্ষরতা দানের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো ৮ই সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালের ৮-১৯শে সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। আর ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো প্রথম দিবসটি উদ্‌যাপন করলেও ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Reading the past, writing the future' অর্থাৎ 'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব'। পৃথিবীর সব মানুষকে নিজেদের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মূলত এই দিনটির প্রচলন হয়েছে। সারাবিশ্বে লক্ষ করলে দেখা যায়, সাক্ষরতার হার যাদের বেশি বৈশ্বিক উন্নয়নে তারাই এগিয়ে। সাক্ষরতা আর উন্নয়ন দুটোই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সাক্ষরতা বলতে সাধারণত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নতাকে বোঝানো হলেও বর্তমানে এর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক। এখন এর সঙ্গে জীবনধারণ, যোগাযোগের দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দক্ষতাও সংযোজিত হয়েছে। তাই দিবসটি যথাযথভাবে পালনের গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই ইউনেস্কো প্রদত্ত সাক্ষরতার সংজ্ঞা ব্যবহার করে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এটি একটি ন্যূনতম সংজ্ঞা এবং অনেক উন্নত দেশ এর চেয়ে কঠিন সংজ্ঞা নিজ দেশের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিবেচনা করে। দেশে দেশে সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনেক আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রদান করেছে। এক সময় কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষর হিসেবে তাকে বলা হয় যে তিন শর্ত পালনে সক্ষম– যে ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সারাবিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকেই ভিত্তি করে সাক্ষরতার হার হিসাব করা হয়। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে, তবে বর্তমানে এটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এখন বলা হচ্ছে, সাক্ষরতাকে সরাসরি ব্যক্তির জীবনমান পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

পৃথিবী যখন প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে তখন শত সম্ভাবনা থাকার পরও আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি অংশ এখনো নিরক্ষরতার বেড়াজালে বন্দি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আমাদের দেশে বর্তমানে সাত ও এর চেয়ে বেশি বয়সি শিক্ষিতের হার ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ (পুরুষ ৫৯.৮ ও নারী ৫৩.৯) এবং ১৫-এর চেয়ে বেশি বয়সি শিক্ষিতের হার ৫৮.৬ শতাংশ (পুরুষ ৬২.৯ ও নারী ৫৫.৫)। মোট জনসংখ্যার একটি অংশ এখনো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে বন্দি জীবনযাপন করছে। এই দারিদ্র্যের মূল কারণই হচ্ছে শিক্ষা এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব। শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতার আর সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। বঞ্চিত এবং নিরক্ষর শিশু-কিশোর এবং যুবকদের শিক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসম্পদে পরিণত করা দরকার। তাই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে যার যার অবস্থান থেকে সকলকে এগিয়ে আসা জরুরি। নিরক্ষরতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি এক একটি হানাদার শত্রুর মতো। এই শত্রুকে হত্যা করতে যে অস্ত্র দরকার তা হচ্ছে শিক্ষা ও সাক্ষরতা। এজন্য চাই সবার জন্য শিক্ষা। চাই নিরক্ষরমুক্ত, শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল আধুনিক বাংলাদেশ। আসুন, আমরা সমাজ এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলাই এবং আলোকিত সমাজ গড়ি, আগামীর সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনি।

লেখক: গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

সুহৃদ সরকার

সুদূর অতীত থেকে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ছিল অপার সম্ভাবনা। সম্ভাবনার দরোজা খুলে যায় ১৯৭২ সালে পর্যটন শিল্প করপোরেশন গঠনের মধ্য দিয়ে। আর এই মহৎ কর্মটি সম্পাদন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। করপোরেশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব এবং সরকারি অর্থায়নে ও সহযোগিতায় পর্যটন নগরী কক্সবাজার, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, সিলেট কুয়াকাটা, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, যশোর, মেহেরপুর এবং আরো বেশ কিছু এলাকায় হোটেল, মোটেল, পিকনিক স্পট, রেস্তোরাঁ, সুইমিং পুল ও পর্যটন সুবিধাসমুহ সৃষ্টি করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সেবা প্রদানে অবদান রেখে চলেছে।

অপরদিকে পর্যটন ও হোটেল শিল্পের উন্নয়নে মানবসম্পদ ব্যবহার করার লক্ষ্যে তাদেরকে দেশ-বিদেশে তারকা হোটেল, রেস্তোরাঁ, এয়ারলাইন্স এবং অন্যান্য পর্যটন ব্যবসায় উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে। আর এই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এখান থেকে এ যাবৎ প্রায় ৪৪ হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পর্যটন শিল্পে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে বিভিন্ন দফায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে খাদ্য উৎসবের আয়োজন করে যাচ্ছে। এই সব খাদ্য উৎসবে ২শ ৫৫টির বেশি প্রকারের বাংলাদেশি খাদ্য প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের দেশে-বিদেশে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিজস্ব বাণিজ্যিক বিপণনের উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে সংস্থা নিজস্ব বিপণন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড' নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১লা নভেম্বর ২০১১ থেকে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের শুল্কমুক্ত পণ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্কমুক্ত বিপণি পরিচালনা করছে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে বিদেশগামী ও আগত পর্যটকদের জন্য ৩টি শুল্কমুক্ত বিপণি, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি শুল্কমুক্ত বিপণি এবং চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বহির্গমন ও আগমন লাউঞ্জে একটি করে শুল্কমুক্ত বিপণি পরিচালিত হচ্ছে। শুল্কমুক্ত পণ্যসেবার পাশাপাশি পর্যটকদের সুবিধার্থে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২টি স্ন্যাকস কর্নার এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রামে ৩টি স্ন্যাকর্স কর্নার পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত বিপণিসমূহ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শুল্কমুক্ত বিপণিগুলোয় পাওয়া যায় বিদেশি ব্রান্ডের সিগারেট, ড্রিংকস, প্রসাধনসামগ্রী ও খাদ্যসামগ্রীসহ দেশীয় তৈরি সিল্ক, জামদানি, কাতান, টাঙ্গাইল সুতি শাড়ি, নকশি বস্ত্রজাত সামগ্রী, পিতল, বাঁশ, চামড়া, বেতের হস্তশিল্পজাত সামগ্রীসহ বিদেশে রফতানিযোগ্য দেশীয় পণ্য।

পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কক্সবাজার, রাঙামাটি, খুলনাসহ অন্যান্য স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে ২ থেকে ৪ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১ হাজার ২শ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশবাহিনী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে তাদের চাহিদানুযায়ী এনএইচটিটিআই কর্তৃক দক্ষ মেস ওয়েটার ও কুক তৈরিতে স্বল্পমেয়াদি কোর্স পরিচালনা করা হয়।

প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ, সকাল ও বিকাল দুই শিফটে পরিচালিত কোর্স সমূহ নিচের ছকে দেখানো হলো:

ক্র.	কোর্সের নাম	মেয়াদকাল
১.	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২.	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট (১ শিফট)	১ বছর
৩.	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
৪.	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস সেক্রেটারিয়াল অপারেশন	১৮ সপ্তাহ
৫.	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৬.	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৭.	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাউজ কিপিং অ্যান্ড লন্ড্রি	১৮ সপ্তাহ
৮.	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারি অ্যান্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৯.	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি অ্যান্ড ট্যুর অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ

পরিকল্পনা শাখা পর্যটন করপোরেশনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখার বিভিন্ন কাজের মধ্যে রয়েছে– পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি, প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে পর্যটন কার্যক্রমের সমন্বয়করণ।

বিদেশি পর্যটকদের আগমন, বাংলাদেশি পর্যটকদের বহির্গমন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পর্যটন খাতে প্রাপ্ত আয়-ব্যয়সহ যাবতীয় তথ্য এই সংস্থা সংরক্ষণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম:

ক্র.	প্রকল্পের নাম, প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও বাস্তবায়ন কাল	
১.	পর্যটনের উন্নয়নে পর্যটন সম্ভবনাময় স্থানসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। প্রকল্প ব্যয়: ১৯৯.৭৫ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১৬–জুন ২০১৭	সমুদ্রকন্যা কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার, পটুয়াখালি জেলার রাঙাবালির সোনারচরে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গঠন, কুয়াকাটা, তালতলা ও পাথরঘাটাকে নিয়ে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল গঠন, ভোলার মনপুরা ও চর কুকরি-মুকরি, টাঙ্গুয়ার হাওর, সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জ, পঞ্চগড়, নেত্রকোনার বিরিশিরি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বরগুনা জেলার তালতলীতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহের প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে: ✓ কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ; ✓ নেত্রকোনায় বিরিশিরি ও খালিয়াজুড়িতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ; ✓ সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ; ✓ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ; ✓ পঞ্চগড়ে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ; ✓ বারেকের টিলায় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ; ✓ সিলেটের জাফলং-এ পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।
২.	চট্টগ্রামের পরকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন। প্রকল্প ব্যয়: ৬২১১.৩৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৭–ডিসেম্বর ২০১৯	একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে টেকসই পর্যটন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪টি কটেজ, একটি হোটেল, একটি ওপেন স্টেট কাম রেস্তোরাঁ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণামূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরো যেসব প্রকল্প চলমান রয়েছে

১. আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ।
২. পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া ও বাংলা বান্দায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।
৩. জাতীয় হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ ক্ষতিগ্রস্ত সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন।
৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সড়ক উন্নয়ন।
৫. ফরিদপুর এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।
৬. কুমিল্লার লালমাই এলাকায় ও বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।
৭. পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে সুবিধা প্রবর্তন।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ–

1. Development of Tourism Resort and Entertainment Village at Parjaton Holiday at Cox's Bazar.
2. Establishment at International Standard Tourism Complex at Exiting Motel Upal Compound of BPC at Cox's Bazar.
3. Establishment of a 5 star Motel & others Facilities at exiting Motel Sylhet Compound of BPC at Sylhet.
4. Establishment of Intentational Standard Hotel Cum Training Center on exiting land of BPC at Muzgunni, khulna.
5. Establishment of Star Standard Hotel at Bagerhat.

গত অর্থবছরে ৫ বছরের পর্যটন খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণ (লক্ষ টাকা):

অর্থবছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০১২-২০১৩	১২৫৫.২৫	১৮৬২.৬৬	৯৩.৪১%
২০১৩-২০১৪	৫৯৫.০০	৬৪৪.৮১	৯৯.৯৭%
২০১৪-২০১৫	২১৪৯.০০	২০৭৪.৪২	৯১.৯৭%
২০১৫-২০১৬	৫৭০.০০	৫৪১.২৯	১০০%
২০১৬-২০১৭	১৪৯.৮১	১৪৯.৮১	১০০%

গত ৫ বছরের বিদেশি পর্যটক আগমন পরিসংখ্যান এবং সরকারের আয়ের পরিমাণ:

বছর	পর্যটক আগমনের সংখ্যা	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১২	৫,৮৮,১৯৩ জন	৮২৫.৪০
২০১৩	২,৭৮,৭৮০ জন (১ম ছয় মাসের)	৯৪৯.৫৬
২০১৪	-	১২২৭.৩০
২০১৫	-	১১৩৬.৯১
২০১৬	-	৮০৭.৩২

লেখক: প্রাবন্ধিক

শরৎ ও কাশফুল: দুজন দুজনার

সুলতানা বেগম

বাংলার প্রকৃতিতে ঋতুর আগমন ঘটে পালাক্রমে। একেক ঋতু একেক রূপে এসে হাজির হয় এবং আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। এই ঋতুর বদল হয় দুই মাস পর পর। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত–এই ছয় ঋতুই বাংলার প্রকৃতির অবিরত রং বদলায়। গ্রীষ্মের রৌদ্র-দহনের পরে আসে বর্ষা। আর এই বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারা জীবন ও প্রকৃতিতে নিয়ে আসে শীতল প্রশান্তি। তখন আকাশ ছেয়ে থাকে কালো মেঘে। মেঘ ভারাক্রান্ত বর্ষার পরেই শরতের আগমন। সুনির্মল স্নিগ্ধতা নিয়ে সুনীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে নিঃশব্দ চরণে আসে বাংলার প্রকৃতিতে। এর রূপরাশি নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। শরৎ মানেই চারদিকে সৌন্দর্যের জোয়ার আর

আনন্দের কালোচ্ছ্বাস। মাঠ-প্রান্তরে সবুজের সমারোহ, নবীন ধানের মঞ্জুরিতে উদ্বেল সবুজের ঢেউ। নদীতীরে শুভ্র কাশের গুচ্ছ। বনে বনে ফুলের সমারোহ। দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়ার কণ্ঠে সুমধুর রাগিণী। অরণ্যে-উঠানে শিউলি ফুলের গন্ধ-মদিরতা। ভোরের ঘাসে ও পাতায় শিশিরের আলিম্পন– এসবই শরৎ ঋতুর অনবদ্য প্রকাশ। শরতের আবেদন তাই প্রতিটি মানুষের কাছে আদরণীয়। দেশের মাটি আর মানুষের সাথে মিশে আছে শরৎ। এত মায়া, এত মমতা আর এত ভালোবাসার ঢেউ অন্য ঋতুতে পাওয়া কঠিন।

প্রকৃতিতে যখন শরৎ আসে তখন কাশফুলই জানিয়ে দেয় শরতের আগমনি বার্তা। শরতের বিকেলে নীল আকাশের নিচে দোল খায় শুভ্র কাশফুল। কাশফুল সম্পর্কে সকলেরই জানা দরকার। আসলে কাশফুল হচ্ছে ঘাস জাতীয় ফুল। এর মঞ্জুরি (ডাটা) অনেক লম্বা হয়। মঞ্জুরির মধ্যে অনেকগুলো শাখা থাকে। সেই শাখা পূর্ণ হয়ে ফুল ফোটে। এ ফুল মূলত দুধরনের। একটি পাহাড়ি কাশ, অন্যটি চর অঞ্চলের কাশ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Saccharum Sloontaneum, পালকের মতো নরম এর সাদা ফুল। এই ফুল মনের কালিমা দূর করে। শান্তির বারতা বয়ে আনে।

কাশবনে উড়ে বেড়ায় লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ ও কালো ধূসর রাঙা প্রজাপতি। দারুণ পিপাসা নিয়ে মৌমাছি ছুটে আসে কাশবনে। শরতে কাশফুল ছাড়া নানা জাতের শারদীয় ফুল জুঁই, চামেলি, শিউলি, টগর, মালতির সৌরভ ও সৌন্দর্য প্রকৃতিকে মোহনীয় করে তোলে। শরৎ-প্রভাতে ঝরা শিউলির গন্ধে আমোদিত হয় চারদিক।

শরতের সকালের সৌন্দর্য তুলনাহীন। এ সময় শিশিরে ধুয়ে যায় মাঠঘাট-পথ-গাছপালা। সূর্যের আলতো কিরণে ঝলমল করে ওঠে শিশির বিন্দুগুলো। আকাশ জুড়ে মেঘেরা ওড়াউড়ি করে। মেঘগুলো যেন উড়তে উড়তে কাত হয়ে যায়। কখনো উধাও হয়ে যায়। এমনি করে সকাল পেরিয়ে গড়িয়ে আসে শরৎ দুপুর। শরৎ দুপুরের আলোয় ঘাস, ধান, বাঁশঝাড়, খড়ের চালে জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো শুকিয়ে যায়। নীলের গভীরতা বেড়ে যায় আকাশে। সাদা হালকা মেঘ আনমনে উড়ে বেড়ায়। নীরব পাখা মেলে ওড়ে সাদা চিল। মেঘের কাছাকাছি ডানা মেলে ঈগল। আসলেই শরতের দুপুর বড়োই নির্মল। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হয় তখন এর রূপ আরো মায়াবী মনে হয়। রোদ তার তেজ কমিয়ে নিজেকে অনেকটা শীতল করে নেয়। সবুজ গাছগাছালি রোদ পেয়ে বেশ তাজা হয়ে ওঠে। বনানির মতো মাঠও সবুজ হয়ে ওঠে। আর শরৎ রাতের রূপতো অতুলনীয়। এ সময় চাঁদ সারারাত ধরে সুবিস্তৃত শ্যামলের বুকে ঢেলে দেয় রুপালি জোৎস্নাধারা। শরতের জোৎস্নাময়ী রাত স্নিগ্ধতা আর কোমলতার অপূর্ব সম্মোহন। এসময় দল মেলে ফুটে থাকে শাপলা-শালুক। কামিনী ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করে বাতাস। জোৎস্নার স্বচ্ছ ছায়ায় পাখিরা ভুলে যায় রাতের গভীরতা। কচি ঘাসের ডগায় সঞ্চিত হতে থাকে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা। আকাশে দেখা দেয় ঘন তারকার বন। রাতভর একটানা জ্বলে। আবার জ্বলতে জ্বলতে কত তারা নিভে যায়। শরতের পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্নায় মন ভরে ওঠে। কী অপূর্ব জ্যোৎস্না রাতের দৃশ্য।

শরৎ উৎপাদনেরও ঋতু। বর্ষার অবারিত বর্ষণে মাঠঘাট প্লাবিত হলেও পানি নামার সময় থেকে যায় স্তরে স্তরে পলি। শরতে সেই পলিতে কৃষক বোনে তার আগামীর স্বপ্ন–সবুজ ফসলে ভরা দিগন্ত জোড়া ক্ষেত। এরফলে আশ্বিনের শেষে চাষির মুখে হাসি ফুটবে। ধান পাকবে হেমন্তে–শরৎ সেই হৈমন্তিক বাণী শোনায় কৃষকের কানে। শরৎ সৌন্দর্য-বৈভবের পাশাপাশি ছুটির ঋতু, অবকাশের ঋতু। এ সময় শিউলি তলে, শিশির স্নাত তৃণমূলে, আকাশের নীল সমুদ্রে, দোয়েল-শ্যামার শিসে শোনা যায় কেবলই ছুটির আমন্ত্রণ ধ্বনি। প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তির বন্ধন ছিন্ন করে শরৎ সকলকে নিয়ে যায় বাইরের জগতে। বাঙালির মনকে সে দাঁড় করিয়ে দেয় সৌন্দর্যের তীর্থভূমিতে।

শরৎ কেবল অফুরন্ত স্নিগ্ধ-বিমুগ্ধ সৌন্দর্যের ঋতুই নয়– উৎসব-আনন্দের ঋতুও বটে। শরতের আগমনে উৎসবের সাজে সুসজ্জিত হয় বঙ্গ জননী আর পুলকিত হয়ে ওঠে বাঙালির হৃদয়-মন। এসব কারণেই শরৎকে 'ঋতুরানি' বলা হয়। তাই উৎসবে-আনন্দে শরৎ চিরকালই বাঙালির প্রিয় ঋতু।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা

নাজনীন সুলতানা নীতি

গণহত্যা সম্পর্কিত অধ্যয়ন বা গবেষণা বিংশ শতাব্দীতে এসে একটি আলোচিত প্রসঙ্গে পরিণত হলেও সভ্যতার শুরু থেকে পৃথিবীব্যাপী অগণিত হারে গণহত্যা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান আইনবিদ রাফায়েল লেমকিনের মাধ্যমে গণহত্যাযজ্ঞ বিষয়টি genocide নাম পেয়েছে। এদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ বিংশ শতকের অন্যতম নৃশংস গণহত্যা। এ ধরনের ব্যাপক মানব বিধ্বংসী ঘটনা কখনোই পূর্বাভাসবিহীন হঠাৎ করে সংঘটিত হয় না। শাসক ও শোষিতের নিয়ত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় গণহত্যার এক দীর্ঘ প্রেক্ষাপট। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়।

সাতচল্লিশ পূর্ব সমগ্র ভারতবর্ষ একশত নব্বই বছর বৃটিশ শাসনাধীন একটি উপনিবেশ ছিল। ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে সব ধরনের ষড়যন্ত্র এবং অপকৌশল তারা গ্রহণ করেছিল। বিশাল এই উপমহাদেশের কোটি কোটি নিরীহ মানুষ তখন বৃটিশদের শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত হয় ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকিসব অঞ্চলকে নিয়ে আরেকটি দেশ গঠন করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না করে পাকিস্তান নামে একটি দেশ গঠিত হলো এবং বাকি অঞ্চল নিয়ে ১৫ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হলো ভারত। এই বিভাজনের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে পাকিস্তান নামে অদ্ভুত এক দেশের জন্ম হলো যার দুই অংশ দুটি পৃথক স্থানে অবস্থিত। মাঝখানে দুই হাজার কিমি. ব্যবধান রেখে পাকিস্তানের দুটি অংশ পরিচিত হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে।

একাত্তরের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা

দুটি অংশের মাঝে ভূখণ্ডগত ব্যবধানসহ আচার, আচরণ, ঐতিহ্য, পোশাক, সংস্কৃতি সবকিছুই ছিল ভিন্ন। তারপরও ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে অনগ্রসর পূর্ব পাকিস্তান আশা করেছিল পাকিস্তানের দুটি অংশেই সমতাভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন দেশ ভাগের পূর্বে এই অঞ্চলটি বৃটিশ প্রশাসনের অবহেলার দরুন যেসব বাধা-বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিল, দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে সে দুর্ভোগের অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবতার রূঢ়তা ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকল পরবর্তী চব্বিশ বছরের বিভেদ-বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনা আর ষড়যন্ত্রের এক অনবদ্য ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। এই সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে শুধু অবহেলাই করেনি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, সামরিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রতি তারা নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান শাসনের নামে এদেশে তারা অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ তথা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছিল। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ তথা আন্তঃরাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ঔপনিবেশিক শক্তি একটি দেশের মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ স্বকীয়তা ধ্বংস করে নিজেদের শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। আর এখানেই পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। দীর্ঘ ২৪ বছর যাবত পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সমৃদ্ধির একমাত্র উৎসমূল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ। সে অনুযায়ী বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাধান্য থাকা উচিত ছিল অথচ সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। পাকিস্তানের দুটি অংশের সম্পূর্ণ বাজেটের পঁচাত্তর শতাংশ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। সেনাবাহিনীতেও পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতসব অন্যায় সবই মুখ বুজে সহ্য করছিলেন, যতদিন তাদের ভাষার ওপর কোনো আঘাত আসেনি। কিন্তু ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঘোষণা করলেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' তখন বাঙালিদের পক্ষে চুপ করে থাকা ছিল অসম্ভব। একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন সেই দেশে সে ভাষাই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী ছিল। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও উর্দু ভাষার কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ এ ভাষায় কথা বলত। তারপরও যখন এই অন্যায্য আরোপ এল, বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিল, শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলন। আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যেদিন ভাষার ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে। এ ঘটনায় সারাদেশ জ্বলে উঠেছিল সেদিন। বাংলা ভাষার দাবিতে উপর্যুপরি বিক্ষোভ, ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তানের শোষণ, শাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়। এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার বিরুদ্ধে বাঙালি আবারো ঐক্যবদ্ধ হয়। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের দমনমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালির ঐক্যের স্ফুরণকে ছাইচাপা দিতে পেরেছিলেন মাত্র, নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণ যে যার জায়গা থেকে সকল বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এমনি সময়ে বাঙালির মুক্তির পথপ্রদর্শক হয়ে এগিয়ে আসেন আওয়ামী লীগের তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির এক অসাধারণ দলিল। এই দাবি উত্থাপনের অপরাধে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁকেসহ আওয়ামী লীগের বেশ কজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবার স্বাধীনতার দাবি হয়ে বাঙালি একমাত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিণত হলো। বলা যায়, ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা

আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ছয় দফা পরবর্তী ছাত্রদের এগারো দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয় সত্ত্বেও সরকার গঠনে বঞ্চিত করা এসবকিছুই ছিল একটি পরাধীন জাতির মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রক্রিয়া মাত্র। বিশেষ করে ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এমনটি কল্পনাও করতে পারেনি পশ্চিম পাকিস্তান। এই নির্বাচন শুধুই জনগণের চোখে ধুলো দেবার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। তারা ভেবেছিল রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ব্যস্ত থাকায় নির্বাচনে কেউ বেশি ভোট পাবে না। এদিকে অস্থিরতার অজুহাত দেখিয়ে সেনাবাহিনী এদেশকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখার পাঁয়তারা করে। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনের ফল তখন নতুন ইতিহাস লিখতে বসেছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান এভাবে নিজেদের অজান্তেই বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

প্রশিক্ষণরত নারী মুক্তিযোদ্ধা

দুর্নিবার বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার পথে চূড়ান্ত রূপে এগিয়ে দেয় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ। ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ভাষণ একটি মাইলফলক। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'; এই ভাষণ সেদিন সমগ্র জাতিকে একটি লক্ষ্যের প্রতি ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এ ভাষণের মাধ্যমেই শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা হলেও ৭ই মার্চের পর থেকেই মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং আন্দোলন জোরদার রূপ ধারণ করে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও ৯ই মার্চ পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পশ্চিম পাকিস্তান যেন তাদের শাসনতন্ত্র পৃথকভাবে তৈরি করে নেয় কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের সূত্রপাত করবে এবং নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরি করবে। এ সময় থেকেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণহত্যার প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। তার আদেশে বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়। ইয়াহিয়া খান ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলার মানুষকে তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে না দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিস্থিতি উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে সাজানো বৈঠকের আয়োজন করতে থাকে। অন্যদিকে দেশের নৌ ও আকাশপথে প্রচুর অস্ত্র গোপনে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়।

এমনি উত্তেজনাপূর্ণ থমথমে পরিস্থিতির ভেতর ২৫শে মার্চ রাত থেকে পাকিস্তান সামরিকবাহিনী শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। সেদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত প্রদান করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে রওয়ানা হয়ে যায়। যাবার পূর্বে *এশিয়ান টাইমসের* ভাষ্য অনুযায়ী সামরিকবাহিনীর বড়ো বড়ো অফিসারদের নিয়ে একটি বৈঠকে ইয়াহিয়া নির্দেশ করেছিল, 'তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা কর, তখন দেখবে তারা আমাদের হাত চেটে খাবে'। সেভাবেই ২৫শে মার্চ রাতে শুরু হয় গণহত্যা যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের সকল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া। সেইরাতে এগারোটা বাজতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাসদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তারা পিলখানাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক, খিলগাঁওয়ের আনসার সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ও ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে হামলা চালায়। এতে শত শত অফিসার, জওয়ান, শিক্ষক ও ছাত্র নির্মমভাবে নিহত হন। অনেক ঘরবাড়ি ও পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। মর্টার হামলা চালানো হয়। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলো পুরোপুরি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন একরাতেই সেনাবাহিনী প্রায় সাত হাজার নিরীহ- নিরস্ত্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। ধ্বংসযজ্ঞ সেদিন সবে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার ত্রিশ হাজার মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ১৯৭১-এর এপ্রিল এবং মে মাসে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়। চট্টগ্রামেও মোট অধিবাসীর অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এসময় হানাদার বাহিনীর করালগ্রাস থেকে বাঁচতে পূর্ব পাকিস্তানের ৩ কোটি মানুষ দিকভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এক কোটি মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ঢাকা থেকে দশ লক্ষ মানুষ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানেও রেহাই মেলেনি। পাকিস্তানিরা ঢাকা, চট্টগ্রামের পর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসলীলা অব্যাহত রেখেছিল।

এতকিছুর পরও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ভেঙে পড়েনি। বরং বিপরীতই হয়েছিল। পঁচিশ মার্চ রাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে যখন ঢাকা পুড়ছিল সে আগুনে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান গঠনের বিভ্রান্তিটুকুও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছিল। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর দেশব্যাপী সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর ওপর পালটা হামলা শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরসমূহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আকাশপথে ও নৌপথে গ্রামের পর গ্রাম ও শহরে হামলা চালিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করে অসহায় সাধারণ গ্রামবাসীকে। নবজাতক শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি তাদের বন্দুক ও বেয়নেটের খোঁচা থেকে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন। লুণ্ঠিত হয় বহু মূল্যবান সম্পদ। পাকিস্তানিরা বাংলার মাটিতে পোড়ামাটি নীতি সফল বাস্তবায়ন করেছিল। তারা কতটা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল সেটি একজন পাকিস্তানি সৈন্যের স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়, 'আমাদের হিন্দু ও কাফির (ঈশ্বরে অবিশ্বাসী)দের হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। জুন মাসের একদিন আমরা একটি গ্রামে অভিযানে যাই এবং সেখানে আমাদের কাফিরদের হত্যা করতে বলা হয়। গ্রামের সব নারীরা তখন পবিত্র কুরআন পাঠ করছিল। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য ছিল। কমান্ডিং অফিসার আমাদের কোনরকম সময় নষ্ট না করার আদেশ দিয়েছিলেন' (*বাংলাদেশ জেনোসাইড আর্কাইভ*)। বোঝা যায়, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বিধর্মীদের হত্যার অজুহাতে যে গণহত্যা চালিয়েছিল সেখানে ধর্ম কোনোভাবেই মুখ্য বিষয় ছিল না, মুখ্য ছিল রাজনৈতিক কুচক্র।

১৯৭১ সালে সবচেয়ে বেশি গণহত্যার শিকার হন এদেশের কিশোর, তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গ। বিভৎস এই গণহত্যার খবর যেন

কোনোভাবে বাইরের বিশ্ব না জানতে পারে সেজন্য প্রেস সেন্সর করা হয়। সংবাদ পাঠানোর সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো পৃথিবীকে জানান দিয়ে যাচ্ছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উভয় অংশের অখণ্ডতা রক্ষা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের মূল শর্ত। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী লোক এই ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ববিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান তার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে সকল ধরনের বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর'। বহির্বিশ্ব ভুট্টোর এসব বানোয়াট তথ্য বিশ্বাস করেছিল এমনকি তাকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষ সবধরনের সহযোগিতাও প্রদান করেছিল। '৭১-এর জুলাই মাসে বাইরের সংবাদপত্রে ছবিসহ প্রথম বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। খ্যাতনামা সাংবাদিক সাইমন ড্রিং সব ধরনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে *ওয়াশিংটন পোস্টের* মাধ্যমে গণহত্যার খবর সারা পৃথিবীতে জানিয়েছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানের *মর্নিং নিউজের* স্বনামধন্য সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসক্যারেনহাস *সানডে টাইমসে* একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যা পুরো বিশ্বের সামনে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার বিভৎসতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। অ্যান্থনি ম্যাসক্যারেনহাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য নিজের চাকরি, নিজের নিরাপত্তা কোনোকিছুই বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এভাবেই বেশ কিছু বিবেকবোধসম্পন্ন উদ্যোগ পাকিস্তানের অক্ষুণ্নতা প্রসঙ্গে বহির্বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিতে সক্ষম হয়। তবু প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশ এগিয়ে আসেনি আবার স্বাধীন হওয়ার পরও অধিকাংশ দেশ থেকে স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

একাত্তরের গণহত্যা

একাত্তরের গণহত্যা

বাইরের প্রভাবশালী পত্রপত্রিকায় গণহত্যার খবর প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় ভুট্টোর সরকার বুঝতে পারছিল আন্তর্জাতিক মহলকে আর ধোঁকায় রাখা সম্ভব নয় আবার পূর্ব পাকিস্তানকেও অধীন করে রাখা যাবে না। এবার পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য এক জঘন্য পরিকল্পনা করল। তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অনুগতদের সমন্বয়ে রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী গড়ে তোলে। পাকিস্তানের অনুগত এই দোসরেরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে এ অঞ্চলের তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করত। দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে তারা পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে বন্দি করত। সেখানে হাত, পা, চোখ বেঁধে তাদের অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হতো। তারপর সেভাবেই হানাদার বাহিনীর নির্দিষ্ট কিছু ইটভাটায় নিয়ে হত্যা করে ফেলে রাখা হতো যেগুলো এখন বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ঢাকা জেলায় সবচেয়ে বেশি ৭৪টি গণকবর পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২৩টিই মিরপুরে অবস্থিত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গণকবর পাওয়া গিয়েছে ময়মনসিংহ জেলায় (৫২টি)।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো পূর্ব বাংলা বিধ্বস্ত এক মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার মুক্তিবাহিনী অপর্যাপ্ত অর্থ ও অস্ত্রের জোগান ও সংগঠনহীনতার দরুণ সর্বশক্তি দিয়েও পাকিস্তানকে ঠেকাতে পারছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সুসংগঠিত এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ছিল। তাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিল আমেরিকা। তবে ৩রা ডিসেম্বর থেকে যখন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলে বাংলার আকাশে তখন থেকে স্বাধীনতার সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছিল। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলার মুক্তিবাহিনী মাত্র বারো দিনের মাথায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় বরণে বাধ্য করেন। ১৬ই ডিসেম্বর এল সেই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির দিন। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম নৃশংস গণহত্যার পাথর বুকে করে লক্ষ লক্ষ অমূল্য জীবনের মূল্য দিয়ে প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে শোষণ বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে জন্ম হলো এক নতুন ভূখণ্ড, বাংলাদেশ।

লেখক: শিক্ষক, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয়

খান চমন-ই-এলাহি

অবশেষে সময় সত্য হয়ে ওঠে
সময় সেই ইতিহাস–যা ঘটে
তা নিয়মিত বর্ণে বর্ণে ভাষায় বিন্যাস করে!
বাঙালির জীবনেও এ সত্য বার বার প্রমাণিত
সিরাজের পলাশীর আম্রকানন, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা
বারো ভূঁইয়ার বুকের জমিনে সাহস
বীর চট্টলায় সূর্য সেন, প্রীতিলতার আত্মাহুতি
বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান এবং
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' মুজিব কণ্ঠ
ষড়যন্ত্র পরাজিত করে সাত মার্চ উনিশশ একাত্তর
রমনার রেসকোর্স সবুজ জমিন থেকে উত্থিত হয়ে
জীবন রক্ষায় বৃক্ষের অক্সিজেনের মতো
ঢুকে যায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালিত্বে
এবং স্বদেশ-বিদেশ, দ্বিগ্‌বিদিক...
অতঃপর পঁচিশ মার্চের কালরাত–গণহত্যা!
নৃশংস গণহত্যায় কেঁপে ওঠে অন্তরীক্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মাটি
রক্তে রঞ্জিত হয়ে স্বাধীন সূর্যের রং নেয়
ফলে দীর্ঘ ন'মাস পরে ষোলো ডিসেম্বর
পৃথিবীর আঁতুড়ঘরে বিজয় নিয়ে
লাল-সবুজে উড্ডীন পতাকায়
জাতীয় সংগীতে
বাঙালির শাশ্বত চেতনায় ভর করে জন্ম নেয়
আমার বাংলাদেশ–বাংলাদেশ।

কী বলিতে চাও সংগোপনে

মিলি হক

বর্ষার মেঘমালা যাবে চলে
আসিবে শরতের মেঘমালা
ফাগুনের দক্ষিণ হাওয়া
আসিও তুমি মালা লয়ে
পরায়ে দিতে নিজ হাতে
করিও না দ্বিধা সংকোচের লোকলাজে
তোমার গন্তব্য কী বলো মোরে
কেন আসিলে জাগাতে
ছিলাম পড়ে বৃন্দাবনে
মাখনের মতো মেঘ মেখে
চুপচাপ মেনে নাও
বলো না ভালোবাসি সখী
প্রতীক্ষার প্রহর গোনো
শরৎ আসিলে শিউলি ছড়াবে–
ঝরে যাবে?
ফাগুনের চঞ্চল হাওয়ায়
ঝরা পাতার মতো
ঝরে যাওয়া কী অতই সহজ!

কে নেবে পাষাণ ভার

সাদিয়া সুলতানা

বেদনার পাষাণ ভার বয়ে বয়ে ঝড় তুলতে এই আমি
নীলাম্বরকে বললাম, নেবে কিছুটা ভার আমার?
আকাশ হেসে বলে, সদা নীল আর রংধনু আগলাতে বেলা যায় আমার।
পাহাড়কে বলতেই, নেবে ভাই কিছুটা ভার আমার,
বলল পাহাড়, সেই কবে কোন কালে বুকে নিয়ে পাষাণ ভার,
ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি, দিও না ভাই বোঝার ওপর শাকের আঁটি।
শেষ বেলা সাগরকে সুধালাম,
বলল সাগর, তীরে এই বালুকাবেলায় তোমার নামটি লেখ।
জীবন স্রোতে দুঃখ-তাপ সব যাবে ঘুচে।

ঘুরে এলাম

বাবুল তালুকদার

পৃথিবী ঘুরে এলাম
বর্ণমালার বিমানে চড়ে
সর্বত্র এখন আমার ভাষা
জাতির ভাষা
লাবণ্যে ভরা বাংলা ভাষা
আত্মীয়ের বন্ধন দৃঢ় হয় বাংলা ভাষায়
সুখ-দুঃখের সাথি হয় বাংলা ভাষায়
স্বার্থ সেখানে মূল্যহীন প্রায়
প্রবাস চিত্তে তখন জীবনানন্দ দাস কথা বলেন
আবার আসিব ফিরে
ধান সিঁড়ি নদীটির তীরে
বাংলা মায়ের কোলে
বঙ্গবীর শহিদ ভাইয়ের প্রতি
শ্রদ্ধা জানাতে বাংলা ভাষায়
প্রতিবছর।

বিধিলিপি

শাহনাজ

বাইরে এত দ্রোহ আর ভাঙচুর
ভেতরটা শান্ত আর নিষ্প্রাণ
চিরকালের এই আমি বন্ধুহীন
আর নিঃসঙ্গ বলে, আমার বিধিলিপি
নিজের মতো থাকতে দেয় না আমায়,
আমাকে ছুটিয়ে বেড়ায়, কেবলি ছুটিয়ে বেড়ায়
পিছু হতে দেবে না জেনেও, মৌমাছি স্বভাব
বোলতা ফুটিয়েছে হুল।

পৌষপাবনের মেলা

মিলন বনিক

বিলের ধান কাটা শুরু হবে।

রহমতের আনন্দের শেষ নেই। কদিন ধরে রহমত স্ত্রী গুলমেহেরের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করছে। স্ত্রীর সাথে সাত কথা পাঁচ কথা বলছে। আজও বারান্দায় বসে স্ত্রীকে ডেকে বলছে, এবার ফসলটা ভালা হইছে বউ। ক'দিন পরেই ধান কাটা শুরু হইবো। ধান কাটা হইয়া গেলে তোমার লাইগা একখান টেলিভিশান কিনুম। তয় কালার না, সাদা-কালা। তুমি মাঝে মইধ্যে সিনামা দেখতে পারবা। বাজারের টেলিভিশনে সিনেমার নায়িকাগো নাচ দেখলে মাথা আউলা হইয়া যায়। মাথায় খালি চক্কর মারে।

সাত বছরের মেয়ে তুলি। ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। নিজের হাতে মুখ ধুইয়ে দিয়েছে। কোলে বসিয়ে মেয়েকে আদর করে বলছে, আইজ আমার তুলি মায়েরে ক্ষ্যাতে নিয়া যামু। আমার তুলি মা হইলো সাইক্ষ্যাত লক্ষ্মী। কী সোন্দর ধান হইছে! আমার লক্ষ্মী মাইয়াডা একবার চক্কর দিয়া আইলেই জমির ধানে গোলা ভইরা যাইবো।

রহমতের চোখে স্বপ্ন। দিন দিন ধানগুলোর রং পালটে যাচ্ছে। এই সেদিনও সবুজ মাঠ ছিল। এখন হালকা সোনালি রং হয়েছে। এবার তেমন একটা মড়ক পড়েনি। সকালে তুলিকে নিয়ে জমির আইল ধরে হাঁটছিল। কুয়াশায় পা ভিজে যাচ্ছে। রহমতের লুঙ্গিটা কোঁচা করে বাঁধা। খালি পায়ে বাবার হাত ধরে হাঁটছে তুলি। আলের কোনো এক জায়গায় এখনও ভেজা কাঁদা মাটি রয়ে গেছে। রহমত মেয়েকে কোলে করে কাঁদাজল মাড়িয়ে পাড় করে দিয়েছে।

– বুঝলি মা, আর কয়দিন পর পৌষ মেলা। তরে এবার মেলায় লইয়া যামু। তুই যা কবি তাই লইয়া দিমু।

– কী লইয়া দিবা বাজান?

– কইলাম তো, তুই যা কবি তাই। ক তুই কী লবি।

– আমারে তুমি আলতা, চুড়ি আর লাল ফিতা কিইন্যা দিবা।

– আইচ্ছা তাই কিইন্যা দিমু। একটা লাল জামাও লইয়া দিমু। লাল জামার লগে এসব পড়লে আমার তুলি মায়েরে যা সোন্দর লাগবো না!

তুলি খুশি হয়। জমির আলের উপর দুটো খেজুর গাছ। রহমতের নিজের গাছ। প্রতিদিন বিকালে এসে খেজুর গাছ কেটে মাটির হাঁড়ি বসিয়ে দেয়। রাতে একবার এসে দেখে যায়। যা রস পায় তা একটা বড়ো হাঁড়িতে ঢেলে বাড়ি নিয়ে আসে। আবার খালি কলসি বসিয়ে দেয়। পাশেই নদীর ধারে আরো কয়েকটা খেজুর গাছ। মেম্বারের গাছ। রহমত ঐ গাছগুলোও বর্গা নিয়েছে। ওগুলো থেকে যা রস হয়, সেগুলো তিন দিন গেরস্তের আর চারদিন রহমতের। তারপরও পাড়ার কিছু দুষ্ট ছেলে রাতে এসে রস খেয়ে যায়। কাঁচা রস খেতে খুব মজা। তাই মাঝে মাঝে পাহারা দিতে হয়।

কুয়াশার চাদরে চারপাশ ঝাপসা। রহমত প্রথম গাছে উঠেই রসের হাড়িটা সাবধানে নামিয়ে আনল। শীতের প্রথম খেজুর রস। হাঁড়িটা মাটিতে রাখার আগেই একটা সাদা কাপড় কলসির মুখে বেঁধে রসটা ছেঁকে নেয়। তুলিকে এক গ্লাস কাঁচা রস দিয়ে বলল,

– ল মা, খাইয়া ল। এই শীতের পরথম রস। খালি পেটে খাইলে মেলা শক্তি হয়। শইল ভালা থাকে। এমন খাটি রস আর কই পাবি মা?

তুলি এক চুমুক খেয়ে বলল,

– বাজান রসটা বড়োই মিষ্টি। তারপর আর এক চুমুকে সব খেয়ে ফেলল।

– ল তাইলে আরেক গেলাস খা। অহনও মাটিতে রাখি নাই। তারপর আমিও এক গেলাস খামু।

রহমত মেয়েকে আরেক গ্লাস রস দিয়ে বলল,

– খাইয়া ল।

তারপর নিজেও এক গ্লাস কাঁচা রস ঢকঢক করে গিলে আলহামদুলিল্লাহ বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। বড়োই শান্তি পাইলাম। চল এবার অন্য গাছের রস পাইড়া লই। তর মায়েরেও কাঁচা রস খাওয়াইতে হইবো। খাঁটি রস।

দুটো জমির মাঝখানে পাড়ের মতো একটু উঁচু জায়গা। তাতে কয়েকটা আমগাছ। একটি হিজল গাছ ও একটি খেজুর গাছ। মাঝখানে ছোটো একটা শ্মশান মন্দির। খেজুর গাছটি রহমতের জমির পাড়ে উঠেছে বলে রহমত সেটা ভোগ করছে। মাঝখানের উঁচু জায়গাটা একটু প্রশস্ত। এক সময় হিন্দুদের শ্মশান ছিল। মরা পোড়ানো হতো।

শ্মশানসহ পুরো জমিটা ছিল খোকাবাবুদের। তখন দেশে যুদ্ধ চলছে। খোকাবাবুর এক ছেলে দুই মেয়ে। ছোটো মেয়েটা কলেজে পড়ত। বড়ো মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে যুদ্ধের আগে। রহমতের তখন বারো-তেরো বছর বয়স। রহমতের বাবা মোতালেব মিয়া খোকাবাবুদের জমি-জিরাত দেখাশুনা করত। চাষবাস করত। সাথে রহমত বাবাকে সাহায্য করত। একদিন রাতে মোতালেবের ডাক পড়ল খোকাবাবুর ঘরে। সাথে রহমতও গেল। মোতালেবের অনেক চিন্তা। এত রাইতে বড়ো বাবু কেন ডাকল? দ্যাশের অবস্থাও ভালো না। মোতালেব কড়জোড়ে মিনতি করে বলল, বাবু ক্যান ডাকছেন? কোনো অসুবিধা হইছে? খোকাবাবু মোতালেবের কাঁধে হাত রেখে ঘরের ভেতর নিয়ে ফিসফিস করে কিছু কথা বলল। খোকাবাবুর চোখে মুখে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। চোখ ঠিকরে বের হচ্ছে ঘৃণার আগুন। পেছনে কড়া নাড়ছে দেশপ্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম দিয়ে মেয়ের ইজ্জত রক্ষা হবে কী করে? তারপর হাতে একটা চাবি আর কিছু কাগজ দিয়ে বলল, তুই দেখে শুনে রাখিস। চাষবাস করে নিজে ভালোই চলতে পারবি। আর ছেলেটাকে মানুষ করবি।

রহমত শুনেছে সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের আলী মাতবর কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে এসেছিল। খোকাবাবুর সাথে বাড়াবাড়ি হয়েছে। যে মাতবর খোকাবাবুর সামনে কখনও চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করেনি, সেই মাতবর খোকাবাবুকে শাসিয়ে গেছে, অহন দিন আমাগো। থাকতে হইলে আমাগো কথামতো থাকতে হইবো। না হইলে তোমাগো মাসির দ্যাশে চইলা যাও। নাইলে এমন সোন্দরী মায়া ঘরে রাইখা বেশিদিন থাকতে পারবা না। শেষে মানও যাইবো, ইজ্জতও যাইবো। দিনকাল খুউব খারাপ।

পরদিন সকালে রহমত বাবার সাথে গিয়ে দেখে খোকাবাবুরা কেউ নেই। সদর দরজায় তালা ঝুলছে। এক রাতের মধ্যে বাড়িশুদ্ধ লোক কোথায় গেল কেউ জানতে পারেনি। মোতালেব মিয়া ভাবে, আইজ বুঝি আইলো। খোকাবাবু আসে না। অপেক্ষার দিনগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। একসময় যুদ্ধ থেমে যায়। দলে দলে অনেকে আবার দেশে ফিরে আসছে। খোকাবাবুরা আর ফিরে আসেনি। হয়ত ঘৃণায় কিংবা লজ্জায়। মাতবরের মতো লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে হয়ত স্বেচ্ছা পরাজয় মেনে নিয়েছে।

সেদিন রহমতরা খোকাবাবুর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। দরজা খুলে পুরো বাড়িটা যত্ন করে ঝাড়ু দিয়েছে। চৈত্রসংক্রান্তির দিনে খোকাবাবুর বউ নির্মলা দেবী যেভাবে নিজের হাতে সারা বাড়ি পরিষ্কার করতেন, ঠিক সেভাবে। মোতালেব বউকে ডেকে বলছে, ও বউ, তুমি তাড়াতাড়ি গোসল কইরা আসো। তারপর আগে বাবুদের তুলসি গাছের গোড়ায় বেশি কইরা পানি দাও। গাছটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আছে। বাবু আইসা যদি এই অবস্থা দ্যাখে কী ভাববো? হাজার হোক বাবুদের খাইয়া পইড়াই তো বাইচা আছি। এই বাড়ি আমাগো কাছে আমানত রাইখা গেছে। আমি জানি না, এই আমানত আমি কীভাবে রক্ষা করুম। হে আল্লাহ, তুমি আমারে সাহায্য কইরো।

রহমতের মা এসে তুলসি তলায় পানি দেয়। বাড়ির সামনে ফুলগাছগুলোতে একের পর এক বালতি পানি ঢালে রহমত। উঠোন বাড়ি পরিষ্কার করে। অপেক্ষা করতে থাকে, আজ বুঝি খোকাবাবু আসবে। কোনোদিকে এতটুকু ময়লা জমতে দেয়নি। বাবু এসে অপরিষ্কার দেখলে মনে কষ্ট পাবে। একসময় তুলসি গাছটা মরে যায়। নতুন করে আর লাগানো হয় না। সেখানে দুটো লাউ গাছের লতা মাচাং বেয়ে লিক লিক করে ঘরের চাল ছুঁতে চলেছে। বেদিটা খালি পরে আছে। ফুল গাছগুলো মরে যায় একের পর এক। নতুন ফুল গাছ আর লাগানো হয় না। ওখানে ক'টা ধানি মরিচ, ক'টা ঢেঁড়স, শীতের দিনে কিছু ধনে পাতা ছিটিয়ে দেয়। তাতে নিজেদের প্রয়োজনটা মিটে। গোটা বাড়ির চেহারাটা আস্তে আস্তে বদলে গেল। এখন সবাই জানে এটা রহমতের বাড়ি।

সারা গ্রাম রটে গেছে খোকাবাবুরা নেই। মানইজ্জত নিয়ে যুদ্ধের ভয়ে পালিয়েছে। একদিন আলী মাতবরের সাঙ্গপাঙ্গরা এসে সব জমি দখল করে নিয়েছে। শুধু বাড়ি-ভিটা আর গড়াই বিলের দুই টুকরা জমি ছাড়া বাকি সবগুলো জমি এখন আলী মাতবরের। ব্যাপারটা এমন যে, দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। আলী মাতবরকে খুব বিশ্বাস করত খোকাবাবু। দেশের অবস্থা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ হতো। সেই বিশ্বাস নিয়ে জমির সমস্ত দলিলপত্র, সোনা-দানা মাতবরের জিম্মায় রেখে ছিল খোকাবাবু। নেহায়েত ভালো মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করেছিল খোকাবাবু। দেশে যুদ্ধ শুরু হলো। রাতারাতি আলী মাতবরের চেহারাও বদলে গেল।

পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে কিছুদিন আগলেও রেখেছিল। খোকাবাবুও নির্ভয়ে ছিল। যেদিন পাক সেনাদের খুশি করার জন্য খোকাবাবুর শেয়ানা মেয়েটার কথা বলল, তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল খোকাবাবু। তার আমানত ফেরত চাইল। আর তখনই মোক্ষম ছোবলটা মারল আলী মাতবর। খোকাবাবুর বুঝতে কষ্ট হলো না। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। আলমারির কোণায় এই দুটো দলিল পড়েছিল। তাই রহমতের বাবার হাতে দিয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করল। এরা হয়ত এটুকু ঠিকই রক্ষা করতে পারবে। মনে মনে ভাবল–আবার যদি কখনও এ দেশে অতিথি হয়ে আসি

তাহলে হয়ত শান্তিতে মাথা রেখে দুটো রাত কাটাতে পারব। সেই রাতেই খোকাবাবুরা দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

কিছুদিন পর এক শুক্রবার জুমার নামাজের পর আলী মাতবর কয়েক জন পাকসেনা নিয়ে খোকাবাবুর বাড়ি এসে দেখে কেউ নেই। মোতালেব মিয়া বাড়ির উঠনে বসে ওজু করছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাড়িঘরের জিনিসপত্র তছনছ করল। শুধু তছনছ করে ক্ষান্ত হয়নি। রহমতকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। গ্রামের কেউ এগিয়ে আসেনি। দূরে দাঁড়িয়ে ঠাঁই দেখছে মোতালেব। এদিকে মাতবর বার বার শাসিয়ে যাচ্ছে– হেরা কই আছে ক? মোতালেব অনেক কাঁদল। বলল, আমি ক্যামনে জানুম। কাইল রাইতে আমার হাতে চাবিটা দিয়া কইল, তুই একটু দেইখা রাখিস। আমি কদিনের জন্য বাইরে গেলাম।

পাকসেনারা কিছুই বিশ্বাস করতে পারছিল না। শেষে মাতবর তাদের কানে কানে কী যেন বলল। সাথে সাথে গর্জে উঠল রাইফেল। লুটিয়ে পড়ল মোতালেব। রহমতের মা বাড়ির পেছনে লুকিয়েছিল। বেগানা পুরুষের সামনে আসতে পারল না মোতালেবের স্ত্রী। পালিয়ে বাঁচল পেছনের দরজা দিয়ে।

শূন্য ভিটায় দাঁড়িয়ে কতদিন কেঁদেছে রহমত। কেমন হাহাকার করত বুকটা। যুদ্ধ শেষ হলো। স্বাধীনতার লাল সূর্যটা যখন দেখল রহমত, তখন ভাবল এবার হয়ত খোকাবাবুরা ফিরে আসবে। যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তারা অনেকেই ফিরে আসছে। খোকাবাবুরা আর আসেনি।

গ্রাম ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে আলী মাতবর। বেশ কিছুদিন শূন্য পড়েছিল ভিটেটা। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আর গ্রামবাসীদের সহায়তায় দলিল দুটোর সুবাদে রহমতের জায়গা হলো খোকাবাবুর ভিটায়। সে ভোগ দখলে রাখবে খোকাবাবুর সম্পত্তি। রহমতের স্বপ্ন বুনা শুরু হলো। এক তালা ছনের ঘর হলো। মাকে নিয়ে সুখেই চলছিল। বাবার ক্ষতটা আজও ভুলতে পারেনি। বাবাকে কবর দেওয়া হলো খোকাবাবুদের শ্মশানে। এই খেজুর তলায়। ছোটো শ্মশান মন্দিরটার পাশে। কেউ কেউ মুসলমানের কবর হিন্দুর শ্মশানে না দেওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত রহমতের কথায় সবাই রাজি হয়।

খোকাবাবুদের সম্পত্তি কম ছিল না। সেই সম্পত্তির সুবাদে ধীরে ধীরে রহমতের উন্নতি হলো। অল্প কয়েক বছরে মাটির ঘর হলো। একমাত্র মাকে নিয়েই ভালো চলছিল দিনগুলো। মাঝে মাঝে বাবার মৃত্যুটা দগদগে ঘা এর মতো যন্ত্রণা দিত। কিছুতেই আলী মাতবরের সেই দৃশ্যটা মন থেকে মুছতে পারছিল না। রাতে ঘুমাতে পারত না। কী এক যন্ত্রণায় ছটফট করত। মা বুঝতে পারে ছেলের কষ্ট। কিন্তু কী করবে? একমাত্র সন্তান রহমতকে নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে মা। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা মিলে মোতালেবের কবরে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করে। শহিদের মর্যাদা পায় মোতালেব। রহমত প্রতি বছর বাবার কবরে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করে–যেদিন খোকাবাবুরা ফিরে আসবে সেদিন তাদের আমানত ফেরত দিয়ে মাতবরকে দুনিয়া থেকে শেষ করে দেবে। রহমতের তখন টগবগে যৌবন।

সময়ের সাথে দৃশ্যপট পালটে যায়। পাঁচ-ছয় বছর পর ফিরে এল মাতবর। ঠিক আগের দাপটে। আবার বিচার হলো। রহমতকে খোকাবাবুদের সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। শুধু রহমতের হাতে যে দুটো দলিল আছে তা সে রাখতে পারবে। বাকি সব জমি আলী মাতবরের দখলে চলে গেল। তার পরের বছর মাতবর গ্রামের মেম্বার হয়ে গেল।

বাবার কবরের পাশে এই খেজুর গাছটাও ছাড়তে চায়নি মাতবর। ভাগ্যিস গাছটা সামান্য জমির দিকে ঝুঁকে ছিল। আজ এত বছর পর সাত সকালে তুলিকে নিয়ে খেজুরের রস পারতে গিয়ে রহমতের সব কথা মনে পড়ে যায়। কাঁধের গামছা দিয়ে চোখের জল মুছল। মনের বোঝাটা কিছুটা হাল্কা হলো। তুলিকে জড়িয়ে ধরে মনটা হু হু করে কেঁদে উঠল। তুলি ছোটো মেয়ে। কী বুঝবে? বাবাকে বলল,

– আব্বা তুমি কান্দো ক্যান?

– কই নাতো আম্মা। চোখে ময়লা পড়ছে। তাই চোখটা মুইছা নিলাম।

মেয়েকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয় রহমত। তারপর থরথর করে গাছে উঠে গেল। নিচেই ধান ক্ষেত। কী সুন্দর সোনালি ধান। রস নামাতে গিয়ে উপর থেকে বার বার ক্ষেতের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল রহমত।

আজ নন্দনপুর গ্রামে পৌষ পাবনের মেলা বসেছে। আশপাশে দশ গ্রামের মানুষের আনন্দ এই মেলাকে ঘিরে। প্রতিটা বাড়িতে নতুন ধানের পিঠা পায়েস। হরেক রকম পিঠা। রহমতেরও আয়োজনের কমতি নেই। আগের দিন রাতে রহমতের বউ রাত জেগে চাল গুড়া করেছে। খুব সকালে উঠে পিঠা বানাতে বসেছে। গরম গরম পিঠা। গরম রসে চুবিয়ে খেতে ভারী মজা। পেট ভরে খেয়েছে রহমত। তুলির বাটিতে আর একটা পিঠা দিয়ে বলল,

– ল মা আর একটা ল। তোর মার হাতের যশ আছে। মায়ের হাতের পিঠার মজাটাই আলাদা।

তারপর বউকে বলল,

– ও তুলির মা, আমারে আরেকটা দাও। তুমিও খাইয়া লও। সকাল সকাল মেলায় যাইতে হইবো।

বউ বাধ সাধল–

– আমি যামু না। তুমি তুলিরে লইয়া যাও। ওরে কী কী কিনা দিবা কইছ তা কিইনা দিও। মাইয়াটা খুশি হইবো।

– হ হ সবই কিনা দিমু। তোমার জন্য কী লাগব কও?

– আমার কিছু লাগবো না। আমার কী আর সাজনের বয়স আছে?

– কী যে কও না তুমি। কী এমুন বয়স হইছে? তোমারে কখনও একখান ভালা কাপড় কিইনা দিবার পারি নাই। তোমার লাইগা একখান লাল বেনারসি লমু। তোমারে যা মানাইবো না!

– পোলাপানের মতো কী সব কও না। বলে রহমতের বউ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। লজ্জা পেয়েছে।

সত্যিই তো। এই ঘরে আসার পর নিজের দিকে কখনও খেয়াল রাখতে পারেনি। চাষা-ভুষার সংসার। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ক্ষেত-খামার এসবের মধ্যে সংসারটা সীমাবদ্ধ। সকালে মিজ্জি আজান আর মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙে। তারপর একটানা খাটাখাটুনি। সন্ধ্যার আগে গরু-ছাগলকে খাইয়ে গোয়ালে বেঁধে তারপর রান্নাবান্না। হাতে কিছু সময় থাকলে ধান ভানা, চালগুলো চালুনিতে চেলে আলাদা করা, ধানের বীজগুলো যত্ন করে রাখা– সংসারের কত কাজ। কখন যে সময় চলে যায় টেরও করতে পারে না। আজ রহমতের মুখে লাল বেনারসির কথা শুনে মনটা কেমন করে উঠল। লজ্জায় দৌড়ে গিয়ে আলমারির সাথে লাগানো আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে নিল। ছেড়া আধময়লা শাড়িটা মাথার উপর টেনে ধরে বউ সাজার ভান করল। ওদিকে রহমত ডাকছে–

– ও বউ কই গেলা। বেনারসির কথা কইছি দেইখা লজ্জা পাইছ না? আরে লজ্জা কর ক্যান? আমাগো একটা মাত্র মায়া। মা'টা বিছানায় পড়া। আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হইতাছে। কী করুম কও, গরিবের ঘরে বউ হইয়া আইছ। এটুকুন কষ্ট তো মাইনা

লইতে হইবো। লও তুমিও লও। মেলায় গিয়া ঘুইরা আসি। আমার তুলি মায়েরেও সাজাইয়া দাও।

– আমি গেলে ঘরে মা'রে কে দেইখবো।

– হাছাই কইছো। আইচ্ছা তোমার লাইগা কী আনুম কও?

– তোমার যা মন চাই তাই আইনো। মাইয়াডারে লইয়া যাও। পারলে একটু নাগরদোলা চড়াইয়ো। মাইয়াডার নাগরদোলা চড়নের খুব সখ।

– আইচ্ছা বাবা আইচ্ছা। চড়ামু। তোমার অত ভাবতে হইবো না। মাইয়াডা হইলো আমার পরাণ। আমার কইলজার টুকরা।

মেলায় লোকে লোকারণ্য। চারদিকে দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। নতুন ধানের খই, চিড়া, মুড়ি, বাতাসা। সারি সারি কত রকমের খেলনার দোকান। মনিহারি দোকান। দূরদূরান্ত থেকে ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়িরাও ছুটে এসেছে। এটাই এই অঞ্চলের একমাত্র মেলা। সবার মনেই আনন্দ। একদিকে যাত্রাপালা। একদিকে সার্কাস। অন্যদিকে নাগরদোলা, চড়কি। বাবার সাথে মেলায় এসে খুব আনন্দ পাচ্ছে তুলি। নাগরদোলায় চড়তে গিয়ে কিছুতেই উঠতে চাইছে না। তুলির ভয় করছে। শেষ পর্যন্ত রহমত নিজেও মেয়ের সাথে নাগরদোলায় উঠে বসেছে।

এবার তুলিকে সার্কাস দেখাল। মানুষের কত রকমের কসরত। জাদুর খেলা, সাইকেলের খেলা। মেলা সাতদিন থাকবে। রহমত ভাবছে একদিন বউকে নিয়ে এসে যাত্রাপালা দেখাবে। মেয়ের জন্য চুড়ি, আলতা, রঙিন ফিতা, লাল জামা সবই কিনা হলো। সাথে দুটো পুতুলও কিনেছে তুলি। রহমত না করেনি। এইতো কদিন আগে নতুন ধান বিক্রি করে ভালোই দাম পেয়েছে। সারা বছরের খাওয়ার ধানও রেখেছে গোলায়। ঠিক করেছে এ বছর মেয়েটাকে একটা প্রাইভেট মাস্টার দিয়ে পড়াবে।

এবার শাড়ির দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে। বউয়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবে। কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। তুলিই বার বার বলছে, আব্বা এইটা না, ওইটা লও, ওইটা না, এইটা লও। এইটার রং কেমন? মায়ের রংটা তো শ্যামলা। এই শাড়িটা মানাইবো না। চলো অন্য দোকানে ঘুইরা দেহি। রহমত ভাবছে এতটুকু মেয়ে এত কিছু জানে কী করে। সে বউয়ের জন্য যতবার শাড়ি কিনেছে, এভাবে দেখে কিনতে পারেনি। যা কিনেছে তাই পড়েছে গুলমেহের। কখনো বলেনি যে, এটা পছন্দ হয়নি। তাই রহমতও এসব নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

ওদিকে রহমতের বউ পশ্চিমের বিল থেকে গরু নিয়ে এসে দেখে কে একজন তুলসী তলায় বেদির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পোশাকআশাক বেশ পরিপাটি। পরনে সাদা ফতুয়া আর প্যান্ট। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। তুলসীর বেদিটায় হাত বুলিয়ে দেখছে। গুলমেহের অপরিচিত লোক দেখে শাড়ির আঁচলটা টেনে দিল। ভেতর থেকে রহমতের মা চিৎকার করছে, ও বউ আমারে একটু পানি দিয়া যা। কই গেলি? পোলাটাও নাই। রহমতের বউকে গরু নিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল–

– রহমত ঘরে আছে?

– নাই। মাইয়ারে লইয়া মেলায় গ্যাছে। আপনে কেডা?

– আমি নরেন। আমাকে চিনবেন না। রহমত কখন আসবে?

– চইল্যা আইবো। গ্যাছে তো হেই সকালে। এখন বেলা পইড়্যা আইলো।

– ঠিক আছে। আমি ততক্ষণ পুকুর ঘাটে গিয়ে বসি। চাচির বুঝি খুব অসুখ।

– হ। একবছর ধইরা বিছানায়। উইঠা বসতে পারে না। পেরালাইজ।

– আচ্ছা। ঠিক আছে। রহমত আসলে আমি চাচিকে দেখে যাব।

রহমতের বউয়ের কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। নরেন রহমতের সমবয়সি। খোকাবাবুর ছেলে। আজ এতদিন পর নিজের জন্মভূমিতে এসে সবকিছুকে কত আপন মনে হচ্ছে। চারদিকে সব বড়ো বড়ো বাড়িঘর। নিজেদের পুরানো বাড়িটা নেই। পুকুরের পাকা ঘাটটির পলেস্তারা খসে পড়েছে। অথচ এত দিন পড়েও মায়ার বন্ধন এতটুকু কমেনি। নরেন ইচ্ছে করলে এ জন্মভিটিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে।

রহমতকে পেয়ে নরেন বুকে জড়িয়ে ধরেছে। রহমতও চিনতে পেরেছে। এ যে আমাদের ছোটোবাবু। নরেনকে বাড়িতে নিয়ে এল। নতুন চালের পিঠা খাওয়ালো। রহমতের মনের মধ্যে কোথায় যেন একবিন্দু বৈষয়িক চিন্তা ভর করছে। ছোটোবাবু ফিরে এসেছে। তার সবকিছু ফিরিয়ে দিতে হবে। আবার ভাবছে, যাক এবার আমি মুক্ত। সবকিছু নরেনকে বুঝিয়ে দিতে পারলে আমার শহিদ আব্বার আত্মা শান্তি পাবে।

আজ এতদিন পর মুনিব এসেছে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল রহমত। কী খাওয়াবে, কোথায় বসাবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। খেজুর গাছগুলো আর একবার ছেঁচে দিতে হবে। কাল সকালের কাঁচা রসটা ছোটোবাবুকে খাওয়াতে হবে। রহমত খেজুর গাছ কাটার দাওটা হাতে নিল। চিক চিক করছে দা। তীক্ষ্ম ধারালো। হাত দিয়ে ধারটা পরখ করে নিল। হাতের ইশারায় দা-এর হালকা আঁচড়ে পরতে পরতে উঠে আসে খেজুর গাছের ছালগুলো। একপাশে কোমড়ের সাথে কাঠের আংটা দিয়ে ঝুলিয়ে নিল চারটা মাটির হাড়ি। নরেনকে বলল, ছোটোবাবু আপনে একটু বইয়েন। আমি হাড়িগুলান বসাইয়া আসি। কাইল আপনেরে কাঁচা রস খাওয়ামু।

তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আস্তে আস্তে তুমি তোমার কাজ করো। এর মধ্যে আমি বাড়ির চারপাশটা একটু ঘুরে দেখি। সবকিছু কত দ্রুত বদলে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ রাতটা আমি তোমার বাড়িতে শান্তিতে ঘুমাবো। কাল আমিও তোমার সাথে পৌষ পাবণের মেলা দেখতে যাব। কতদিন যাওয়া হয়নি।

পড়ন্ত বিকেলের সোনা রোদটা জ্বলজ্বল করছে। পশ্চিমের বিলের পাশ দিয়ে সরু খালের পাশ ধরে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রহমত। হাতে দা। সোনা রোদে চিক চিক করছে দা-এর ধারালো অংশটা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে খেজুর গাছের নিচে শুয়ে থাকা শহিদ মোতালেব মিয়ার স্মৃতিসৌধ।

রহমতের ভেতরের মানুষটা আরেকবার জেগে উঠল। মাথায় জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুন। একবার স্মৃতিসৌধ আর একবার দাওটার দিকে তাকায়। তেমোহনী খালের পশ্চিম দিক থেকে লুঙ্গির এক কাঁছা অনেকটা কোমড়ে তুলে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে আসছে আলী মাতবর। পৌষের পড়ন্ত বিকেলের রোদটা হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। রহমত এবার তাকায় আলী মাতবরের দিকে। আরেকবার হাতের দাওটার দিকে। এদিকে ঘরে ছোটোবাবু আছে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। খুব দ্রুত পা ফেলে রহমত। সামনে আলী মাতবর।

তাড়া খাওয়া কুকুরের হৃদপিণ্ডের মতো দ্রুত উঠানামা করতে থাকে আলী মাতবরের বুক। লুঙ্গির কাঁছা ছেড়ে দিয়ে দ্রুত উলটা দিকে দৌড়াতে থাকে মাতবর। পেছনে রহমত... দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই।

বাতাসের মন খারাপ

তাহমিনা বেগম

প্রচণ্ড তাপদাহে পুড়ছে জীবন
গাছেরাও নিথর, নিস্তব্ধ
কোথাও একটু স্বস্তি নেই
হাহাকারের ধ্বনি সর্বত্র,
মধ্যগগনে সূর্যিমামা তার তপ্ত শরীরে
বুঝতে চায় না মানব ও প্রকৃতিকে
পুড়িয়েই যেন তার শান্তি
দিগন্ত পানে দেখি গাছেরা বিলাপ করছে
রাস্তাঘাটে কর্মরত শ্রমিক দরদরিয়ে ঘামছে
ঘামেরা যেন ঘাম নয়, শরীর থেকে বেয়ে পড়া অশ্রু বিন্দু,
কোথাও একটু বাতাসের আভাস নেই
মনে ভীষণ ক্ষোভ,
জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম
মনে হলো রাগে কটমটিয়ে দেখছে
জানা হলো না কেন তার এত রূঢ়তা!
তেষ্টায় প্রাণবায়ু বেরোবার উপক্রম
ক্ষোভ থেকে ক্ষোভ, আর না পেরে জানতে চাইলাম
কেন তার এমন বৈরিতা!
প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে উঠল বাতাসেরা
বলল আমাদের মন খারাপ।
উলটো জানতে চাইল কেন এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন!
নীরব হয়ে গেলাম, কী দেব উত্তর!
বাতাসেরা যেন গুঙিয়ে উঠল, বলল তোমাদের লজ্জা করে না?
তোমাদের কর্মকাণ্ডে আজ আমরাও নিষ্প্রাণ
বাতাসের মন খারাপ তাই চুপটি করে চলে এলাম
বলার মতো কোনো ভাষা নেই
এ যে প্রকৃতির সাথে আধুনিক মনুষ্য সমাজের বিরূপতার দান!

মহাপ্রয়াণে আমার প্রিয়তমা

ম. মীজানুর রহমান

আমার কোলে মৃত্যুকে সাথে নিয়ে ঢলে পড়েছিল প্রিয়তমা।
শুনিনি তো আগে বিরহের এমন করুণতম
বিষণ্ন সুরধ্বনি এ হৃদয় ভরে রইবে জমা!
আমার চোখ বেয়ে যে উষ্ণ অশ্রু পড়েছিল ঝরে
তা যেন উষ্ণ রক্ত হয়ে আমার দু'গাল বেয়ে ঝরে যায় অকাতরে!
এ হৃদয়ে কখন যে শুরু হয়েছিল অধরা রক্তক্ষরণ
তা তো আমি তখনো বুঝিনি!
বুঝি এমন সুরভিত সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটে গেছে এখন
ঝরে যাবে বলে!
অথচ আমি তো কখনো তার কারণ খুঁজিনি।
তাই কি প্রিয়তমা এমনিভাবেই আমাকে একা রেখে অদৃশ্যে যাবে চলে?
কে সেই নিষ্ঠুর পরাক্রম যে আমার প্রিয়তমাকেও ছিনায়ে নিয়ে যেতে পারে?
সে কি পারে না আমাকেও একসাথে একই মিলনমালায় গেঁথে নিয়ে যেতে?
এত বড়ো সমুদ্র কে কবে দেখেছে বলো যার শুরু নেই শেষ নেই পারাপারে!
সেই পাড়ের ভেলায় কোন সে মাঝি দুলায়ে দুলায়ে
তোমাকে আমাকে বয়ে নিয়ে যায় নিরবধি?
বলো, বলো প্রিয়তমা, তার সাথে একবারও দেখা হতো যদি
বলতাম, ওগো মাঝি, তোমার কি এতটুকুও দয়ামায়া নেই,
আমাকে ভেলায় রেখে পারলে তুমি আমার প্রিয়তমাকে অকূলে ডুবায়ে দিতে?
আমার প্রিয়তমার সাথে এ মাটির উপর আর তো হবে না দেখা,
মাটির হৃদয় যে তাকে করেছে গ্রাস!
স্বপ্নও ভেঙে গেছে, কাঁদি শুধু একা একা,
আনন্দ হারায়ে আজ ব্যথার পাথারে বসবাস।
তুমি কি জানো না প্রিয়তমা, আমার বুকেতে জমা বেদনা অপার?
আমার কি আর কেউ আছে যে নেবে আমার এ অশেষ ব্যথার ভার?
কত কথা মনে পড়ে, ছিল কত আশা, ছিল ভালোবাসা;
অতুল্য সেই ভালোবাসা আজ আর নাই;
এ শূন্যের উপর কোথা যাই, কোথা মেলে ঠাঁই,
দুঃখেরও এত গভীরতা? মেলে না উত্তর, থাকে জিজ্ঞাসা।
তুমি কি বলেছ আমায় আমাদের মিলন হবে পরপারে গেলে?
তাই কি এত তাড়া? তুমি চলে গেলে আমাকে পিছনে ফেলে!

[কবির প্রিয়তমা স্ত্রী মনোয়ারা রহমানের মৃত্যু স্মরণে]।

পহেলা সেপ্টেম্বর ২০১৮ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় '১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী'র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পকর্মে জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ফুটিয়ে তোলার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, 'আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। দেশ ও জাতি গঠনে শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপক অবদান রয়েছে। যে-কোনো সংকটময় মুহূর্তে অথবা অন্য যে-কোনো আপদকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা সব সময় সাহসী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তাই শিল্পকর্মে জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। ১লা সেপ্টেম্বর '১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী'র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে একথা বলেন।

বিশ্বের ৬৮টি দেশের চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণে মাসব্যাপী এই আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় ৪৬৫ জন শিল্পীর ৫৮৩টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এশিয়ার বৃহত্তম এই চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশ নেন বাংলাদেশের ১৯৯ জন শিল্পী। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি এই চিত্রকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করেন। পরে রাষ্ট্রপতি ৬ জন শিল্পীকে সম্মানসূচক ও ৩ জনকে গ্রান্ড পুরস্কার দেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদকে ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৮ বঙ্গভবনে 'শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী' উপলক্ষে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়–পিআইডি

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বিনিময়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, কোনো ধর্মই জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ অথবা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। ধর্মকে ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ যাতে সামাজিক শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সেজন্য সব ধর্মের লোকদের আরো সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। ২রা সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বঙ্গভবনে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু ধর্মালম্বীর ব্যক্তিবর্গ, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন

পেশায় নিয়োজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ। তারা রাষ্ট্রপতিকে জন্মাষ্টমীর ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ধর্ম মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায়, জনকল্যাণে অনুপ্রাণিত করে। যদি কেউ আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চালায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং একইসঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া যে-কোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সব আন্দোলন-সংগ্রামে সকল ধর্ম, বর্ণ ও মতের লোকেরা অংশ নেওয়ায় বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে।

উচ্চশিক্ষিত 'অভিজাত বেকার' যেন না হয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সার্কুলার জারি করে দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। অভিভাবকগণ অনেক কষ্ট করে তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করে থাকেন। তাই উচ্চশিক্ষা নিতে এসে তারা যেন শিক্ষিত ও অভিজাত বেকারে পরিণত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 'নবম ইউজিসি স্বর্ণপদক ২০১৬-২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন।

বর্তমানে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তৃতি পেয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার পর বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এটি একটি বিশাল অর্জন। দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র এখন পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। সরকারের যুগোপযোগী শিক্ষানীতি, শিক্ষায় অগ্রাধিকারসহ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বাড়ানোর পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে ইউজিসি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ৩৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে পদক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

ষষ্ঠ জাতীয় কনভেনশনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই সেপ্টেম্বর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ জাতীয় কনভেনশনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে এবং খাদ্যের জন্য যেন আর কোনোদিন বাংলাদেশকে কারো কাছে হাত পাততে না হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য'। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে কৃষিবিদদের প্রতি নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

রিজিওনাল হাব উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই সেপ্টেম্বর হোটেল র‍্যাডিসনে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গ্রুপ-এর ঢাকাস্থ 'রিজিওনাল হাব' উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গা স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবেশের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় তিনি রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইডিবিজি-এর প্রতি আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ আমদানি প্রকল্প ও রেলওয়ের দুটি প্রকল্পের নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে এবং

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ গণভবন থেকে ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর কার্যালয় থেকে যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহে গৃহীত 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প' এবং 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণ প্রকল্প' উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি বিষয়ক প্রকল্প, রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন ও আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন প্রকল্পের উদ্‌বোধন দুই দেশের সম্পর্কের নতুন মাত্রা– যা ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় হবে এবং বন্ধুত্ব আরো অটল থাকবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রংপুরে দুটি সেতুর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় তিতাস নদীর ওপর 'ওয়াই' আকৃতির 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' এবং রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর ওপর 'গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু' উদ্‌বোধন করেন। এছাড়া রংপুর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনও করেন প্রধানমন্ত্রী।

ইন্দো-বাংলা পাইপলাইন উদ্‌বোধন

ভারতের শিলিগুড়ি থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দিল্লি থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ কাজের উদ্‌বোধন করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এ পাইপলাইন নির্মাণ উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার আরেকটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন দুই দেশের মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্কের প্রতীক, নতুন অধ্যায়। দুই দেশের উন্নয়নে আঁধারে আলোর মশাল হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের পার্ক এভিনিউতে Global Hope Coalition-এর আয়োজনে প্রদত্ত 'স্পেশাল ডিসটিংশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন–পিআইডি

অসুস্থ-অসচ্ছল ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অসুস্থ, অসচ্ছল, আহত ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এটাকে বালকসুলভভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সবারই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে'। এলক্ষ্যে তিনি সাংবাদিকতা পেশাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও কল্যাণে ব্যবহারের আহ্বান জানান। তিনি এই ফান্ডে আরো ২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করেন। সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে প্রধানমন্ত্রী নেদারল্যান্ডসের রানি ম্যাক্সিমা, অ্যান্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্রেস্টি কলজুলেইদ ও যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও'র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত স্বাগত সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেন। রোহিঙ্গা সমস্যা, সাইবার নিরাপত্তা, শান্তিরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কন্যাশিশু শিক্ষা এবং বৈশ্বিক মাদক সমস্যা সংক্রান্ত বেশকিছু উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। অধিবেশন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে মানবিক কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারপ্রেস সার্ভিসেস নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রদত্ত 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন। গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস তাঁকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে দূরদর্শী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮ সালের 'আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত গোলটেবিল মধ্যাহ্নভোজ আলোচনায়ও যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সংবর্ধনায়ও অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। অধিবেশন শেষে ১লা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

গুজবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

গুজব, মিথ্যাচার, উসকানি, তথ্য বিকৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ১১ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত 'গুজব: গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সিরডাপ মিলনায়তনে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত 'গুজব: গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্য সচিব আবদুল মালেক এবং প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহারের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার ফজলে রাব্বী, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ওপর একটি জাতীয় প্রচার অভিযান এবং সংবাদপত্র, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ সকল বেতার এবং অনলাইন গণমাধ্যমগুলোতে একযোগে গুজব, মিথ্যাচার, উসকানি ও তথ্য বিকৃতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

জনগণকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিরোধী চক্রের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি, তথ্য ধামাচাপা দেওয়া, চরিত্র হনন। নামে-বেনামে দেশ থেকে, বিদেশ থেকে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এই

অপকর্মে লিপ্ত। এরা আসলে অপরাধী বলেই নাম গোপন রেখে ভিন্ন নামে মিথ্যা তথ্য ছড়ায়। এ অপপ্রচার থেকে রেহাই পেতে 'ডিজিটাল লিটারেসি'র বিকল্প নেই।

সভায় তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গুজব-মিথ্যাচারের হাত থেকে মানুষ ও সামাজিক মাধ্যমগুলোকে রক্ষার জন্য দুটো ছাঁকনি বসানো প্রয়োজন। একটি প্রযুক্তিগত ছাঁকনি, অপরটি মনের ছাঁকনি। অপরাধী শনাক্ত করার জন্য প্রযুক্তিগত ছাঁকনি, আর সামাজিক মাধ্যমে যা দেখা যাবে, যাচাই না করে তাই বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত না হবার জন্যই মনের ছাঁকনি। মনের ছাঁকনি দিয়ে আগে যাচাই, তারপরে বিশ্বাস করার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে '১০ম আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব'-এর সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন–পিআইডি

গুজবের অপসংস্কৃতি অনেক পুরনো উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারাই সাম্প্রদায়িক উসকানি দেয়, তারাই গুজব রটনা করে। গুজব রটনাকারীদের কালো থাবা থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে রক্ষা করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গুজব শনাক্তকরণ ও নিরসন কেন্দ্র করার বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচারের খেলা শুরুতেই শেষ করে দিতে হবে।

পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার বিতরণ

গণমাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অবদানের জন্য এ বছর একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি 'পিআইবি- সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার ২০১৮' লাভ করেছে। ৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাকরাইলে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার হলে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এ পুরস্কার প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি উভয়েই সমাজকে স্বচ্ছ করে। সেকারণে গুজব, মিথ্যাচার, চরিত্র হনন ও তথ্য বিকৃতির কোনো স্থান সাইবার জগৎ ও গণমাধ্যমে নেই। প্রশাসনের ভুলত্রুটির বিষয়ে যেমন গণমাধ্যম সোচ্চার, তেমনি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর পদস্খলনের বিষয়েও গণমাধ্যমের সোচ্চার হওয়া উচিত। ভারসাম্য রক্ষার নীতির দোহাই দিয়ে অপরাধী নেতা-নেত্রীকে কোনো ছাড় দেওয়া গণমাধ্যমের কাজ নয়ও বলে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ

চলচ্চিত্র শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে গাজীপুরের কবিরপুরে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি' নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি টিএসসি মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত '১০ম আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা জানান।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন নয়, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা বিস্তার করতে পারি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বিকশিত করতে পারি আমাদের সংস্কৃতি। রক্ষা করতে পারি ঐতিহ্য ও পরিবেশ। নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী এমনকি দর্শকরা– আমরা সবাই যদি এ ব্যাপারে সচেতন থাকি তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনে চলচ্চিত্রের গৌরবময় ভূমিকা নিঃসন্দেহে বেগবান হবে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ৬০ লাখ টাকা এবং ১টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য ৪০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতিসত্তা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ– সবকিছুর দিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, ৭২টি দেশ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

দেশের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে আছেন এবং থাকবেন বঙ্গবন্ধু

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে আছেন এবং থাকবেন। আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু আমরা যেন তাঁর কন্যাকে রক্ষা করতে পারি এবং তাঁর কন্যার পাশে থাকতে পারি– এটাই হোক আজকে আমাদের সকলের ব্রত। ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন স্বাধীন দেশ, তাঁর কন্যা দিয়েছেন অপ্রতিরোধ্য-অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ'– এ কর্মযজ্ঞের জন্য 'ধন্যবাদ' বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, যিনি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে একটি জাতির ২৭ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরে দেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত করেছিলেন। '৪৭ থেকে '৫২, '৫২ থেকে '৬৬, '৬৬ থেকে '৭০ এবং '৭০ থেকে '৭১– কোথায় নেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান! তাঁকে ধন্যবাদ। ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' নামটি এদেশের মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন। আজকে আমরা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বে ৩২তম বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশ, জিডিপি'র দিক থেকে ৪৩তম বৃহৎ দেশ। আমাদের এ সম্মান এনে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে জানাই ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করে আমাদের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করেছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

সাংবাদিকদের জন্য মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা

সরকার সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহে নিয়োজিত সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের জন্য মূল বেতনের ৪৫% হারে অন্তর্বর্তীকালীন মহার্ঘ ভাতা সুবিধা ঘোষণা করেছে। নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড কর্তৃক পেশকৃত অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বর তথ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১লা মার্চ ২০১৮ থেকে বেতন বৃদ্ধির এ আদেশ কার্যকর হবে। অন্তর্বর্তীকালীন এ সুবিধা পরবর্তীতে ঘোষিতব্য সামগ্রিক বেতন কাঠামোর সাথে সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ্য, তথ্য মন্ত্রণালয় ২৯শে জানুয়ারি ২০১৮ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড গঠন করে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস

১লা সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস'।

জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপিত

২রা সেপ্টেম্বর: সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক ও প্রাণপুরুষ মহাবতার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৩রা সেপ্টেম্বর: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

এনইসিতে ১০০ বছরের বদ্বীপ পরিকল্পনা অনুমোদন

৪ঠা সেপ্টেম্বর: শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা, নদী ভাঙন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উন্নয়নে ১০০ বছরের বদ্বীপ পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

৮ই সেপ্টেম্বর: অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সাক্ষরতা অর্জন করি, দক্ষ হয়ে জীবন গড়ি'।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস

■ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ফিজিওথেরাপি'।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস

১০ই সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আত্মহত্যা প্রতিরোধে কাজ করি একসঙ্গে'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'মোটর সাইকেল শিল্প নীতিমালা ২০১৮' ও 'শিশু একাডেমি আইন ২০১৮'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।

একনেকে ১৮ প্রকল্প অনুমোদন

১১ই সেপ্টেম্বর: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় দেশের ২ হাজার মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ মোট ১৮ প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব ওজোন দিবস

১৬ই সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব ওজোন দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'শীতল থাকার পরিবেশবান্ধব কৌশল/মেনে চলি মন্ট্রিল প্রটোকল'।

মহান শিক্ষা দিবস

১৭ই সেপ্টেম্বর: যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে পালিত হয় 'মহান শিক্ষা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'মানবতার স্বপক্ষে, মানবাধিকার সুরক্ষায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

■ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

ইভিএম ক্রয় প্রকল্প অনুমোদন

১৮ই সেপ্টেম্বর: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বৈঠকে ইভিএম ক্রয় প্রকল্পসহ ১২ হাজার ৫৪৫ কোটি টাকার মোট ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

বিশ্ব আলজেইমার্স দিবস

২১শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব আলজেইমার্স (স্মৃতিলোপ) দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আলজেইমার্সের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হোন'।

পবিত্র আশুরা পালিত

■ শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ইসলামের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র আশুরা পালিত হয়।

বিশ্ব নদী দিবস

২৩শে সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব নদী দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'নদী থেকে নির্বিচারে বালু উত্তোলন বন্ধ কর'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

মানব উন্নয়ন সূচকে ৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

মানব উন্নয়ন সূচকে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে তিন ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, আর্থিক প্রবাহ, যোগাযোগ, পরিবেশের ভারসাম্য এবং জনমিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সূচক তৈরি করেছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। ১৮৯ দেশকে নিয়ে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। এ সূচকে এবার ১৩৬তম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এতে সবার উপরে নরওয়ে। ১৪ই নভেম্বর ইউএনডিপি'র ওয়েবসাইটে এ সূচক প্রকাশ করা হয়েছে।

মানব উন্নয়ন সূচকে এগিয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরো বেড়েছে। এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। এছাড়া পণ্য, সেবা ও জনশক্তি রপ্তানি বাড়বে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের আগে আছে কেবল ভারত। তারা লাভ করেছে ১৩২তম স্থান। পাকিস্তান ১৫০ এবং নেপাল ১৪৯তম অবস্থানে আছে।

ভারত থেকে তেল আনতে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু

জ্বালানি তেল আমদানির জন্য শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের' নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্য দিয়ে জ্বালানি খাতে দুই দেশের সহযোগিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

১৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার গণভবন থেকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এ প্রকল্পের নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন।

এছাড়া ভারতীয় ঋণের টাকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের তৃতীয় ও চতুর্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পেরও উদ্‌বোধন করা হয় এ অনুষ্ঠানে।

'বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন' দিয়ে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলিগুঁড়ির নুমালীগড় তেল শোধনাগার থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপোতে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে।

রোহিঙ্গা সংকট অবসানে প্রধানমন্ত্রীর তিন প্রস্তাব

এক বছরের বেশি সময় ধরে চলমান রোহিঙ্গা সংকট অবসানে তিনটি প্রস্তাব বিশ্বনেতাদের সামনে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সংকটে ভুক্তভোগী দেশের সরকার প্রধান হিসেবে ২৪শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শরণার্থী সংকট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ECOSOC Chamber-এ জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের সভাপতিত্বে 'Global Compact on Refugees: A Model for Greater Solidarity and Cooperation' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এ প্রস্তাব দেন তিনি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী এ বৈঠকে যোগ দেন।

সুপারিশগুলো হলো–মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বাতিল এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে। তাদের জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে একটি 'সেফ জোন' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃতীয়ত, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সুপারিশের আলোকে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

উল্লেখ্য, মিয়ানমারের রাখাইনে সেনা অভিযানে নিপীড়নের মুখে ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এই নিপীড়নকে 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' হিসেবে দেখছে জাতিসংঘও। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনার মুখে মিয়ানমার এসব শরণার্থী ফেরত নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করলেও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে গড়িমসি করছে।

রোহিঙ্গাদের জন্য সহায়তা বাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র

মিয়ানমার এবং বাংলাদেশে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য সহায়তা প্রায় দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এ ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাড়তি সাড়ে ১৮ কোটি মার্কিন ডলার দেবে। এরমধ্যে ১৫ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের পেছনে খরচ হবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ইভিএম অনুমোদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৩ হাজার ৮২৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবহার শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনার জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইভিএম ক্রয় ছাড়াও এ প্রকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ৩১১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। একনেক সভায় ইভিএমসহ ১২ হাজার ৫৪৪ কোটি ৯৪ লাখ টাকা ব্যয়ের ১৪টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ইলিশের জীবন রহস্য উন্মোচন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক বিশ্বে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলমের নেতৃত্বে এ সফলতা আসে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে দুই বছর গবেষণার পর এ সাফল্য এসেছে। প্রথমে বঙ্গোপসাগর ও

মেঘনা থেকে ইলিশ সংগ্রহ করে ডিএনএ প্রস্তুত করে ইলিশের পূর্ণাঙ্গ ডিনোভো জিনোম সিকোয়েন্স বা জীবন রহস্য আবিষ্কার করা হয়। ইলিশের জিনোমে ৭৬ লাখ ৮০ হাজার নিউক্লিওটাইড রয়েছে যা মানুষের জিনোমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এর মাধ্যমে ইলিশের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে। বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে ইলিশের স্টকের সংখ্যা কতটি এবং দেশের পদ্মা-মেঘনা নদীর মোহনায় প্রজননকারী ইলিশগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্টক কি-না তা জানা যাবে এই জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে। বছরে দুইবার ইলিশ প্রজনন করে থাকে। জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে দুই সময়ের ইলিশ জিনগত পৃথক কি-না তা জানা যাবে। এমনকি কোনো নির্দিষ্ট নদীতে জন্ম নেওয়া পোনা সাগরে যাওয়ার পর বড়ো হয়ে প্রজন্মের জন্য আবার একই নদীতেই ফিরে আসে কি-না সেসব তথ্য জানা যাবে এই জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে। মূলত ইলিশের জন্ম বৃদ্ধি, প্রজনন এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াসহ সকল জৈবিক কার্যক্রম পরিচালনা হয় জিনোম দ্বারা।

ঢালাও শিল্পাঞ্চল করা যাবে না

জনবসতি অঞ্চলে ঢালাওভাবে শিল্পাঞ্চল না করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি নতুন করে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থিক সামর্থ্য, ব্যাংক ঋণ, ব্যবসায়ের সুনাম যাচাই করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিমালিকানাধীন একাধিক ফসলি জমি এবং বসতবাড়ি আছে এমন জমি বাদ দিয়ে খাস জমিতে শিল্পাঞ্চল তৈরি করা হবে। সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকে সাধারণত একশ একর জমি রয়েছে এমন প্রস্তাব বিবেচনা করতে হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় জুনায়েদ আহমেদ পলক

ডিজিটাল বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০জন ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণী সংস্থা অ্যাপলিটিক্যাল (Apolitical)। এর মধ্যে বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক নির্বাচিত হয়েছেন। তালিকায়

অন্যান্যদের মধ্যে আছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রতিষ্ঠাতা টিম বারনার্স লি, ভারতের আইটি মন্ত্রী শংকর প্রসাদসহ আরো অনেকে।

৮ই আগস্ট 'ওয়ার্ল্ডস হানড্রেড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল ইন ডিজিটাল গভর্নমেন্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনটি অ্যাপলিটিক্যাল প্রকাশ করেছে।

অ্যাপলিটিক্যাল জানিয়েছে, এসব নির্বাচিত ব্যক্তি স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন। নির্বাচিত ব্যক্তিরা ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন।

অ্যাপলিটিক্যাল একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংস্থা যারা নীতি নির্ধারণের পাশাপাশি জনসেবায় নিয়োজিত নেতৃবৃন্দের বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজে নিয়োজিত। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থাটির কাজের পরিধি বিশ্বের ১২০ টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত। প্রথমবারের মতো প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ জনের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী পলক।

দি ডাটাবেজ সফটওয়্যার পেল বেসিস ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস

৬ই সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এবার মোট ৩৩টি ক্যাটাগরিতে ৭৬টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। রিটেইল-ডিস্ট্রিবিউশন ও রিয়েল এস্টেট সফটওয়্যারে বেসিস ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পেল 'দি ডাটাবেজ সফটওয়্যার'। এবারের আয়োজনের দুই ক্যাটাগরিতে এ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে দি ডাটাবেজ সফটওয়্যার লিমিটেড। প্রথমটি কমজুমার রিয়েল এস্টেট সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে এবং দ্বিতীয়টি কমজুমার রিয়েল অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার পায়।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পরীক্ষামূলক কার্যক্রমে সফল

বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর সফল

উৎক্ষেপণের পর প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক কার্যক্রমেও সফল হয়েছে। সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) চ্যাম্পিয়নশিপ সম্প্রচারের মাধ্যমে স্যাটেলাইটের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। সাত দেশের অংশগ্রহণে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিকালে সরাসরি সম্প্রচার করে বিটিভি। বিটিভির সম্প্রচারে দেখা যায়, উপরে লেখা রয়েছে 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের কারিগরি সহায়তায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর পরীক্ষামূলক সম্প্রচার।'

স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর এখন গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে সংকেত দিচ্ছে ও নিচ্ছে। গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে ট্র্যাকিং ও কন্ট্রোলিংয়ের কাজ হচ্ছে এবং পুরো সিস্টেমকে টেস্ট করা হচ্ছে। গাজীপুর গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে সার্বক্ষণিক মহাকাশে থাকা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর গতিবিধি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিষয়গুলো দেখভাল করছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস এলিনিয়া।

সরকার আইসিটি সেক্টরে ৩০ হাজার দক্ষ জনশক্তি তৈরি করেছে

সরকার দেশের আইসিটি খাতকে শক্তিশালী করতে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আরো ৩০ হাজার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়াং (ইওয়াই) আইসিটি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিবি)'র বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

জানা যায়, ৩০ হাজার তরুণের মধ্যে ১০ হাজার টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ২০ হাজার তরুণ নিয়েছেন ফাউন্ডেশন স্কিল ট্রেনিং।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) পরিসংখ্যান মতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাস জানুয়ারি-জুনে ২৭০ কোটি ২২ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই আয় গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হওয়া ২৫৭ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের চেয়ে ১২ কোটি ডলার বা ৪ দশমিক ৮১ শতাংশ বেশি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানি করা পোশাকের ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশের দখলে।

অটেক্সা-এর তথ্য মতে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৩ হাজার ৮০৪ কেটি মার্কিন ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। এটি গত বছরের প্রথমার্ধের চেয়ে ২ দশমিক ১৯ শতাংশ বেশি।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মোট পোশাক রপ্তানির ৩৩ দশমিক ০৫ শতাংশ রয়েছে চীনের দখলে। তবে তাদের হিস্যা কমছে। গত বছরের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের হিস্যা ছিল ৩৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটিতে ১ হাজার ১২৭ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে চীন। গত বছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি করেছিল ১ হাজার ১৫০ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে, এবার চীনের রপ্তানি ২ দশমিক শতাংশ কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে আছে ভিয়েতনাম। দেশটির উদ্যোক্তারা আলোচ্য ছয় মাসে ৫৭২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এবার ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ। একইসঙ্গে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ, যা গত ডিসেম্বরে

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৮ রেডিসন ব্লু হোটেলে সিআইপি (রপ্তানি) এবং সিআইডি (ট্রেড) ২০১৫-এর কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

ছিল ১৪ দশমিক ৪০ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। তবে সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর থেকেই বাজারটিতে পোশাক রপ্তানি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আছে। দীর্ঘ ১৫ মাস পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই বাজারে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। গত বছর বাংলাদেশ ৫০৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। ২০১৬ সালে রপ্তানি হয়েছিল ৫৩০ কোটি ডলারের পোশাক। তার মানে গত বছর রপ্তানি কমেছিল ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ। সেই অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ৪ দশমিক ৮১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সিআইপি কার্ড পেলেন ১৭৫ ব্যবসায়ী

রাজধানীর রেডিসন ব্লু হোটেলে ৩রা সেপ্টেম্বর বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ (সিআইপি) ব্যক্তিদের হাতে কার্ড তুলে দেন। দেশের ১৭৫ ব্যবসায়ীকে ২০১৫ সালের জন্য সিআইপি হিসেবে কার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

সিআইপি কার্ডধারীরা সচিবালয়ে প্রবেশে বিশেষ পাস ও স্টিকার এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণে বিমান, রেল, সড়ক ও নৌপথ আসন প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন। বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারেরও সুযোগ পাবেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে রপ্তানিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোট ১৭৫ জনকে সিআইপি নির্বাচিত করে।

সুপারব্র্যান্ডস স্বীকৃতি পেল দেশের ২৯ প্রতিষ্ঠান

দেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠান ও খাত হিসেবে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত সুপারব্র্যান্ডস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে–পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপ, আবুল খায়ের স্টিল, ইস্টার্ন ব্যাংক, আইপিডিসি ফাইনান্স ও ইংরেজি *দৈনিক ডেইলি স্টার*। এসব প্রতিষ্ঠান ২০১৮-২০ মেয়াদের জন্য সুপারব্র্যান্ডস হিসেবে গণ্য হবে।

সুপারব্র্যান্ডস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য প্রচারে সুপারব্র্যান্ডস পুরস্কারের লোগো ব্যবহার করতে পারবে। জরিপকারী প্রতিষ্ঠান নিয়েলসেনের মাধ্যমে ৪৮টি দেশে এক জরিপ করিয়ে সুপারব্র্যান্ডস দাবি করেছে, ৭৪ শতাংশ ক্রেতার পণ্যের বিজ্ঞাপনে সুপারব্র্যান্ডস লোগো শনাক্ত করে।

রাজধানীর এক হোটেলে ৩রা সেপ্টেম্বর রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডসগুলোকে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবন এবং জাদুঘর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের দায়িত্ব ভুলে না যায়। দেশ গড়ার কাজে তারা যেন নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলে। এছাড়া প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-৪) বাস্তবায়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ১ হাজার ৬৮১টি মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে এ অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ রোকেয়া হলের নবনির্মিত ৭ মার্চ ভবন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মো. আখতারুজ্জামান ক্রেস্ট প্রদান করেন–পিআইডি

সরকারি হলো ১৪টি কলেজ

দেশের আরো ১৪টি বেসরকারি কলেজকে নতুন করে সরকারি করা হয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০১৮'-এর আলোকে জেলা ও উপজেলার ১৪ টি কলেজ ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি করা হয়।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার মানোন্নয়নের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইড হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও কনভেনশন সেন্টার, ডায়াগনস্টিক ও অনকোলজি ভবন এবং ডক্টরস ডরমেটরির উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মনোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি ঘোষণা

সারাদেশে আরো ৪৪টি মাধ্যমিক স্কুলকে সরকারিকরণের আদেশ জারি করা হয়েছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অন্য কোনো সরকারি বিদ্যালয়ে বদলি হওয়ার সুযোগ পাবেন না।

প্রতিবেদনঃ মো. সেলিম

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

তৈরি হচ্ছে পাঁচ শস্যের সিমুলেশন মডেল

পাঁচ শস্যের সিমুলেশন মডেল তৈরি করা হচ্ছে। কোন ফসল কোন এলাকায় কী ধরনের মাটি ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেয়ে চাষ উপযোগী গবেষণা তথ্যের আলোকে তা উঠে আসবে মডেলটির মাধ্যমে। ৯ই সেপ্টেম্বর ডিএই মহাপরিচালকের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এই সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি সহায়তার লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) এবং বাংলাদেশ সুগার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)-এর সঙ্গে এ সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী, বিএআরআই-এর মাধ্যমে ভুট্টা এবং আলু, বিআরআরআই-এর মাধ্যমে আউশ ধান, বিজেআরআই-এর মাধ্যমে পাট এবং বিএসআরআই-এর মাধ্যমে ইক্ষুর শস্য সিমুলেশন মডেল তৈরি হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ড. মজহারুল সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রকল্পটির অর্থায়নে উল্লিখিত ৪ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওই ৫টি ফসলের জন্য মডেলটি তৈরি করবে। এর মাধ্যমে এ পাঁচ ফসল কোন এলাকায়, কী ধরনের মাটিতে ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেয়ে চাষাবাদ করা যাবে তার একটা দিকনির্দেশনামূলক তথ্য বের হয়ে আসবে–এর ফলে ওই ফসলগুলোর চাষাবাদ ও উৎপাদন দুই-ই ভালো হবে। বর্তমানে কৃষকরা তো আবাদ করছেনই, কিন্তু এর চেয়ে আরো ভালো মানের উৎপাদন করা যায় কি-না, সেলক্ষ্যেই প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

পার্চিং উৎসব উদ্‌যাপিত

ধান ক্ষেতের ক্ষতিকর বালাই দমনে পার্চিং উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ। ৯ই সেপ্টেম্বর ব্রি'র ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সদর দপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একযোগে পার্চিং উৎসবের উদ্‌বোধন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। মূলত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ কৃষকদের মাঝে পার্চিং পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়া এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

জমির ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে পার্চিং বেশ কার্যকর। এ পদ্ধতিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি ইত্যাদি খাড়াভাবে জমিতে পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দিনের বেলায় ফিঙে, শ্যামা ও শালিক পাখি এসব ডালপালায় বসে ধান ক্ষেতের পোকামাকড় ধরে খায়। অন্যদিকে রাতের বেলায় লক্ষ্মী পেঁচা এই ডালে বসে ইঁদুর শিকার করে মাঠ ফসলে অবস্থানকারী ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ১০০ বর্গমিটার ধানের জমিতে একটি করে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিতে হবে। পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ধানের জমিতে রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে আসবে।

উপকূলেও সম্ভব সূর্যমুখী চাষ

উৎকৃষ্ট তেলজাতীয় ফসল হচ্ছে সূর্যমুখী। সূর্যমুখীর বীজে রয়েছে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ তেল। এই তেল সয়াবিন ও সরিষার তেলের তুলনায় অধিক গুণগত মানসম্পন্ন এবং মানুষের শরীরের উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। বছরে প্রায় ২১ লাখ টন তেল আমদানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় বাংলাদেশের। সম্প্রতি এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে লবণাক্ত এলাকায়ও লাভজনক ফসল হিসেবে চাষ করা সম্ভব সূর্যমুখী। বিএআরসি'র অর্থায়নে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত এবং প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এই গবেষণা।

উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে রবি মৌসুমে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা এবং তাপ সহনশীল হওয়ায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিলম্বে আমন ধান সংগ্রহ করার পরও পতিত জমিতে সূর্যমুখী চাষ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। নিয়ম মেনে চাষ করলে প্রতি বিঘায় প্রায় ১৫-২০ হাজার টাকা লাভ পাওয়া যাবে বলেও জানান তারা।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

লেবানন যেতে নারী কর্মীদের টাকা লাগবে না

লেবাননে যেতে নারী গৃহকর্মীদের কোনো টাকা লাগবে না। যাওয়ার আগে নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যয় বহন করবে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি। নারী গৃহকর্মী দেশটিতে যাওয়ার পর কোনো অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখে পড়লে তাকে দ্রুত দেশে আনার ব্যবস্থাও করতে হবে রিক্রুটিং এজেন্সিকে। লেবাননে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি জারি করা নীতিমালায় এসব কথা বলা হয়েছে। লেবাননে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে ২৩শে আগস্ট সাময়িক যে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল মন্ত্রণালয়, নীতিমালা জারির মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। নীতিমালাটি ২৯শে আগস্ট থেকে কার্যকর হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

নতুন নীতিমালায় নারী গৃহকর্মীর ক্ষেত্রে নিজের নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর পড়তে ও লিখতে জানতে হবে। বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৩৮ বছর। কনিষ্ঠ বাচ্চার বয়স (যদি থাকে) কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। অন্তত দুই বছর বিদেশে থাকার মানসিকতা থাকতে হবে। লেবানিজ ভাষায় সাধারণ যোগাযোগে সক্ষম হতে হবে। কোনো অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বাংলাদেশ দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারার দক্ষতা থাকতে হবে। উল্লেখ্য, এর আগে লেবাননের সঙ্গে কর্মী পাঠানের বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো চুক্তি ছিল না।

ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ পদে বাংলাদেশের রুদমিলা

দুর্নীতি দমনে যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সিরিয়াস ফ্রোড অফিস (সিএফও)-এ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছেন বাংলাদেশের মেয়ে রুদমিলা আজাদ। পদের নাম ফাইন্যান্স বিজনেস পার্টনার– যেটি বাংলাদেশে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার। তাঁর বিভাগের কাজ হচ্ছে– নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব, বাজেট প্রণয়ন, খরচের পূর্বাভাস, লোকবল নিয়োগের আর্থিক সামর্থ্য যাচাই ইত্যাদি। সম্প্রতি *দৈনিক প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

রুদমিলার জন্ম ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। ২০১০ সালে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ভর্তি হন লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে। ব্রাইয়ারলি প্রাইস প্রাইয়র (বিপিপি) বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিষয়ে ২০১৫ সালে ডিসটিংকশন পেয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ২০১৭ সালে দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব চার্টার্ড সার্টিফায়েড অ্যাকাউন্ট্যান্টস বা এসিসিএ পড়া শেষ করে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফাইন্যান্স বিজনেস পার্টনার পদে নিয়োগ পান। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিকেরা কাজের অনুমতি থাকলে সরকারি চাকরিতে আবেদন করতে পারেন।

রুদমিলা আজাদ

আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেলেন ডা. নাজমুন নাহার

শিশুরোগ চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য 'আউটস্ট্যান্ডিং এশিয়ান পেডিয়েট্রিশিয়ান' পদক পেয়েছেন অধ্যাপক নাজমুন নাহার। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়া প্যাসিফিক কংগ্রেস থেকে এ পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। এশিয়া প্যাসিফিক পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন এ কংগ্রেসের আয়োজন করে।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নাজমুন নাহার প্রায় এক যুগ বারডেম হাসপাতালের ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া দীর্ঘ ২২ বছর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করেন।

পাকিস্তানে প্রথম নারী প্রধান বিচারপতি

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন তাহিরা সাফদার। তিনিই দেশটির প্রথম নারী যিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন। ১লা সেপ্টেম্বর তিনি শপথ নেন।

জাপানে যুদ্ধবিমানে প্রথম নারী

জাপানে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন একজন নারী। নাম মিসা মাৎসুশিম। বয়স ২৬। ২৪শে আগস্ট থেকে তিনি দায়িত্ব পালন শুরু করেন বলে বিবিসি সূত্রে জানা যায়।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম মুসলিম নারী সিনেটর

অস্ট্রেলিয়ায় বর্ণবাদ বিতর্ক যখন চরমে ঠিক সেই সময়ে দেশটির সিনেটে প্রথমবারের মতো নিয়োগ পেয়েছেন একজন মুসলিম নারী, নাম মেহরিন ফারুকী। ১৫ই আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার সিনেট তাঁকে এ নিয়োগ দেয়। সিনেটর হিসেবে নিয়োগ পাওয়া মেহরিন নিউ সাউথ ওয়েলসের গ্রিন পার্টির এমপি। তার জন্ম পাকিস্তানে।

একাত্তরের জননী রমা চৌধুরীর বিদায়

'একাত্তরের জননী' খ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও সাহিত্যিক রমা চৌধুরীকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় নিভৃতচারী, সংগ্রামী, নির্লোভ, একাত্তরের নির্যাতিত এ নারীর দেহ। ৭৯ বছর বয়সি রমা চৌধুরী ৩রা সেপ্টেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার দিয়ে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর পোপদিয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে সন্তানের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। রমা চৌধুরী ১৯৩৬ সালের ১৪ই অক্টোবর চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তাঁর জীবনের একটি বড়ো সময় কাটে শিক্ষকতায়। ১৯৭১-এ তিনি সর্বস্ব হারান। পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হন। রমা চৌধুরী সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম। তাঁর লেখা ১৮টি বই রয়েছে। এরমধ্যে একাত্তরের জননী, ভাব-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ, শহীদের জিজ্ঞাসা, স্বর্গে আমি যাবো না, নীল বেদনার খাম ইত্যাদি রয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন

ধোঁয়া, ধূলা, বাষ্প এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে বাতাসে ভেসে থাকা কঠিন পদার্থের কণাকে এসপিএম বলে। এটি বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্মল বায়ু ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়নকল্পে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ হবে।

বায়ুদূষণ মূলত দুটি কারণে হয়। প্রথমত, কলকারখানার ধোঁয়া দ্বিতীয়ত, যানবাহনের ধোঁয়া। সার কারখানা, চিনি, কাগজ, পাট, কাপড় তৈরির মিল, চা তৈরির মিল, চা তৈরির ফ্যাক্টরি, চামড়ার কারখানা, গার্মেন্টস, রসায়ন ওষুধ শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া নির্গত হয়। যাতে থাকে নানা রকম ক্ষতিকারক উপাদান। যানবাহন বৃদ্ধি বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। বেবিট্যাক্সি, ট্যাম্পু, মোটর সাইকেল, ট্রলি প্রভৃতি টু-স্ট্রোক যানবাহন থেকে অধিক ধোঁয়া নির্গত হয়। সম্প্রতি সরকার ২০ বছরের অধিক পুরনো গাড়ি রাস্তায় চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বায়ুদূষণের হাত থেকে বাঁচার কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি

ঘি: রাতে ঘুমানোর আগে এবং প্রতিদিন সকালে নাসারন্ধ্রে দুই ফোঁটা ঘি দিতে হবে। প্রতিদিন ২/৩ চামচ ঘি খেলে বায়ুদূষণের কারণে শরীরের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

হলুদ: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১ চামচ হলুদের গুড়ার সঙ্গে ১ চামচ ঘি/মধু খেলে বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ডালিমের রস: প্রতিদিন সকালে বা বিকালে ১ গ্লাস ডালিমের রস খেলে হার্ট এবং ফুসফুস সুস্থ থাকবে।

তুলসী পাতা

বায়ুদূষণের প্রভাব কমাতে তুলসী গাছ দারুণভাবে সাহায্য করে। তুলসী পাতা বাতাসে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদানকে শোষণ করে। ফলে বাতাসে বিষের পরিমাণ কমতে থাকে। প্রতিদিন যদি ১০-১৫ মিলিলিটার তুলসী পাতার রস খাওয়া যায়। তাহলে শরীরের ওপর বায়ুদূষণের যে কুপ্রভাব পড়ে, তা কমতে শুরু করে।

নিম

পানিতে নিমপাতা ফুটিয়ে সেই পানি দিয়ে সপ্তাহে কয়েকবার গা ও মাথা পরিষ্কার করলে শরীরের বহিরাংশে পরিবেশ দূষণের খারাপ প্রভাব কমতে শুরু করে।

বায়ুদূষণ রোধে করণীয়

বাড়ি, কারখানা, গাড়ি থেকে ধোঁয়া নিঃসরণ কমাতে হবে। আতশবাজি ব্যবহার করা যাবে না। ময়লা, জঞ্জাল ডাস্টবিনে ফেলতে হবে, পোড়ানো যাবে না। থুথু ফেলার পর সে জায়গা পানি দিয়ে ধুঁয়ে ফেলতে হবে, সবাইকে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আইন মেনে চলতে হবে।

বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষ বাড়ছে কমছে বাংলাদেশে

বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা তিন বছর ধরে বাড়ছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৭ সালে বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৮২ কোটি ১০ লাখ, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ। ক্ষুধার্ত মানুষ বাড়ার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো। পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি শীর্ষক প্রতিবেদনটি তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চারটি সূচক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এগুলো হলো– অপুষ্টি, চাইল্ড ওয়েস্টিং (উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশু), চাইল্ড স্ট্যান্ডিং ও শিশুমৃত্যুর হার। এ চারটির মধ্যে অপুষ্টি সূচকে গত নয় বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জুলাই ২০১৮ গণভবনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন ভাতার অর্থ ইলেক্ট্রনিক (G2P) উপায়ে বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প পরিদর্শন

ঝিনাইদহ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এসব প্রকল্প পরিদর্শন করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে উপমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশই বিশ্বে প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। এর মধ্যে ঝিনাইদহে ছয়টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

এসডিজি অর্জনে তিন চ্যালেঞ্জ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হলো– পুষ্টিহীনতা ও স্থূলতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আয় বৈষম্য। এগুলো প্রশমন না করতে পারলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাজধানীর লেকশোর হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বার্ষিক লেকচারে কথাগুলো বলেন মালয়েশিয়ার শীর্ষ অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব অধ্যাপক জোমো কেওমি সুনদারায়। অনুষ্ঠানে সিডিপির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, বিশেষ ফেলো ড. মুস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক জেমো বলেন, এসডিজিতে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ পুষ্টিহীনতা। তিনভাবে পুষ্টিহীনতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই– খাবারের অভাব, গুণগত খাবারের অভাব এবং অসচেতন খাদ্যাভ্যাসের কারণে স্থূলতা। খাবারের অভাব অনেকটা কমে এসেছে। তবে গুণগত খাবারের অভাবে ওজনহীনতা রয়েই যাচ্ছে। অসচেতন খাদ্যাভ্যাসের কারণে স্থূলতা বাড়ছে ব্যাপক আকারে। এর ফলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা হ্রাস হলেও পুষ্টিহীনতা কমেনি। বিশ্বে পুষ্টিহীনতার জন্য খরচ হয় প্রতিবছর একেকজন মানুষের জন্য গড়ে ৫০০ ডলার। যা মোট অঙ্কে বিশ্বের জিডিপির ৫ শতাংশ। ২০১৪ সালের ম্যাকাকনজি রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থূলতার কারণে খরচ হচ্ছে ১.৯ থেকে ২.১ বিলিয়ন ডলার।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা এখন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে

বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা নারী ও প্রতিবন্ধীসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন সুবিধাভোগীদের ভাতা বিতরণ প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দেওয়া শুরু হয়েছে। ১৭ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী এসব এলাকার উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কথা বলেন।

সেসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রম চালু হবার ফলে এখন থেকে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী কারো কাছ থেকে কমিশন নিতে পারবে না, কারণ ভাতাভোগীর টাকা তার নিজের অ্যাকাউন্টেই যাবে।

সক্ষম উপকারভোগীরা যেন সরকারি সহায়তার পাশাপাশি কাজকর্মে নিয়োজিত থাকেন সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ভাতা পাচ্ছেন তাদের নিজের কাজ করে নিজের উপার্জন করতে হবে। আমরা এমন পরিমাণ ভাতা দেব যেটা দিয়ে আপনারা আপনাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু সাথে সাথে আপনাকে নিজেকে কাজও করতে হবে।

প্রথম পর্যায়ে গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের উপকারভোগীরা এ সুবিধা পাবেন। প্রথম পর্যায়ে এক লাখ ১৫ হাজার উপকারভোগী তাদের গত এপ্রিল-জুন সময়কালের ভাতাসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাতা পেয়েছেন। এছাড়া চলতি অর্থবছরে আরো ১০টি জেলার উপকারভোগীদের মধ্যে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। পরবর্তীতে সরাসরি ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৬ লাখে উন্নীত হবে বলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাঁচ নির্দেশ

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গঠন করেছে একটি বিশেষ কমিটি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনাসমূহ

১. চলমান অবস্থায় গাড়ির দরজা বন্ধ রাখা

২. স্টপেজ ছাড়া গাড়ি না থামানো

৩. পরিবহণের দৃশ্যমান দুটি স্থানে চালক ও সহকারীর ছবিসহ নাম, মোবাইল নম্বর প্রদর্শন

সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪. দূরপাল্লার যানবাহনে চালক ও যাত্রীর সিটবেল্ট বাঁধা নিশ্চিত করা এবং

৫. মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ দুজন আরোহীকে মাথায় অবশ্যই হেলমেট পরতে হবে।

লেগুনা বন্ধ, পাম্পে হেলমেট ছাড়া বাইকে তেল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত

মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে ও সড়ক পথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশকে সহযোগিতা করছে স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্ট সদস্যরা। ঢাকা মহানগর পুলিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে বেশিরভাগ সড়কে হিউম্যান হুলার ও লেগুনা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক সচেতনতার মাস উপলক্ষে বাস চলাচলও কম ছিল। এদিকে পুলিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হেলমেটবিহীন চালকদের পেট্রোল পাম্প থেকে তেল দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে সেখানে গাড়ি থামাতেও পুলিশকে নিষেধ করতে দেখা গেছে।

টঙ্গী-গাজীপুর মহাসড়কে তিন চাকার যান বন্ধ

১লা সেপ্টেম্বর থেকে টঙ্গী-গাজীপুর মহাসড়কে তিন চাকার সমস্ত যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার। নিষেধাজ্ঞা আরোপের দিন থেকে টঙ্গী-গাজীপুর মহাসড়ক যানজটমুক্ত মহাসড়কে পরিণত হয়। এতে করে সেখানে যানজটও শূন্যের কোটায় নেমে আসে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিভিন্ন রুটে চলবে সরকারি লঞ্চ

বর্তমান সরকার অভ্যন্তরীণ নৌপথ নিরাপদ করা, দক্ষ নৌপরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, নৌপথে ক্রুজ সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে নৌপরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিআইডব্লিউটিসি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি ৩৫টি জলযান নামানোর পরিকল্পনা করেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন নৌ-রুটে বাণিজ্যিকভাবে লঞ্চ পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। বেসরকারি লঞ্চের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন রুটে এই লঞ্চগুলো চলাচল করবে। বিআইডব্লিউটিসি'র নৌবহর শক্তিশালীকরণ ও আধুনিকায়ন করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, সংস্থার জলযান বহরে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন সুবিধার সক্ষমতা বাড়ানো, ভবিষ্যৎ ট্রাফিক ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করাসহ সংস্থার রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই সরকার নতুন প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ শিরোনামে নেওয়া প্রকল্পটি

বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৩১৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা। তার মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে ১ হাজার ২৫৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা এবং বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হবে ৬৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন ২০২২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে দুই বেইজে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। রাজধানী ঢাকাসহ বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৭টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। সূত্র জানায়, সড়ক ও রেল পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় নৌপথ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে নদীপথ সবচেয়ে সহজ, জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকের সঙ্গে জড়িত পুলিশেরও ছাড় নেই

নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ('ক' অঞ্চল) মেহেদী ইমরান সিদ্দিকি হুঁশিয়ার করে বলেছেন, মাদকের সঙ্গে জড়িত কোনো পুলিশ সদস্যদেরও ছাড় নেই। এলাকায় কে কী করে, তা সবই আমরা জানি। সময় থাকতে ভালো হয়ে যান। অন্যথায় কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অনুষ্ঠিত ওপেন হাউজ ডে ও কমিউনিটি পুলিশিং মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সাত্তার।

বরিশাল বিভাগে ৬০০ মাদক ব্যবসায়ী ও সেবী স্বাভাবিক জীবনে

বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মো. শফিকুল ইসলাম বলেছেন, বরিশাল বিভাগে ৬০০ মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীকে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছে। এদের অনেককে কর্মসংস্থান ও চিকিৎসা সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং ও ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজেদেরকে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারে পুলিশ এ বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে কর্মসূচি সফল করতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম চালু করা হয়েছে। তিনি ১২ই সেপ্টেম্বর পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন।

১২০ কেজি মাদকদ্রব্য 'খাট' জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে নতুন মাদক নিউ সাইকোট্রাফিক সাবসটেনসেস (এনপিএস) বা 'খাট'-এর ১২০ কেজির একটি চালান জব্দ করেছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ১৪ই সেপ্টেম্বর বিমানবন্দরের ফরেন পোস্ট অফিস এলাকা থেকে চালানটি জব্দ করা হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে

পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব কলেজে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। প্রতিটি কলেজে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। ২৬শে আগস্ট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত ঈদ-পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

নতুন পাঁচটি কলেজ (চারটি অনুমোদিত হয়েছে, একটি প্রক্রিয়াধীন) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা হবে ৩৬টি। অন্যদিকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ আছে ৬৯টি। এর বাইরে একটি আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, পাঁচটি আর্মি মেডিক্যালসহ দেশে সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১১১টিতে।

আসন বাড়ল সরকারি মেডিক্যাল কলেজে

সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০০ আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে। ৮ই আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

বর্তমানে দেশের ৩১টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা ৩ হাজার ৩১৮টি। এবারে এ আসন সংখ্যা বেড়ে হবে ৩ হাজার ৮১৮টি। রাঙামাটি, পটুয়াখালী, ও হবিগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া অন্যসব সরকারি কলেজে আসন বাড়বে। চলতি শিক্ষাবর্ষে সরকারি- বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ১০ হাজার ৫৫৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন।

এক লাখে যক্ষ্মা রোগী ২৬০ জন

দেশে এক লাখ মানুষের মধ্যে যক্ষ্মার রোগী আছে ২৬০ জন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে যক্ষ্মা শনাক্ত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা-সবই বিনামূল্যে করা হলেও মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ এখান থেকে চিকিৎসা নেয়, ৫১ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আর বাকি ২৯ শতাংশ ওষুধের দোকান থেকে চিকিৎসা নেয়। 'বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা প্রকোপ জরিপ ২০১৫-১৬' প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২৯শে আগস্ট রাজধানীর একটি হোটেলে এ প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, যক্ষ্মার প্রকোপ নারীর চেয়ে পুরুষের

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২৬শে আগস্ট ২০১৮ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নতুন চারটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অনুমোদন ও গোপালগঞ্জে নতুন দুটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য স্থাপনা উদ্‌বোধন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

মধ্যে বেশি। যক্ষা শহরের থেকে গ্রামে বেশি। তবে গ্রাম বা শহর যেখানেই হোক, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ৬৫ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যে যক্ষার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এই জরিপে দেশের ১২৫টি নমুনা অঞ্চলের এক লাখ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা (এক্স-রে ও কফ পরীক্ষা) করা হয় ৩রা মার্চ ২০১৫ থেকে ২৩শে এপ্রিল ২০১৬ সালের মধ্যে। পাঁচটি গবেষণা দল স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি আটলান্টা, জাপানের রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব টিউবারকিউলোসিস এবং বেলজিয়ামের ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এই জরিপে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুমৃত্যু রোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা ও পুষ্টিজ্ঞান

ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক যৌথ প্রতিবেদনে শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে, বিশুদ্ধ পানির অভাব, পুষ্টিহীনতা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকাকে।

এ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ২০১৭ সালে বিশ্বে ১৫ বছরের কম বয়সি ৬৩ লাখ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গড়ে প্রতি ৫ সেকেন্ডে মৃত্যু হয়েছে একজন করে শিশুর। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৭ সালে প্রাণ হারানো ৬৩ লাখ শিশুর অর্ধেকই আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের। সেখানে প্রতি ১৩ শিশুর মধ্যে একজন ৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায়। উন্নত দেশগুলোতে এই মৃত্যু হার ১৮৫ জনে একজন।

মূলত ৫ বছরের কম বয়সি অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় নিরাময়-যোগ্য রোগে। জন্মকালীন জটিলতা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, নিওনিটাল সেপসিসের কারণে তাদের বেশিরভাগের মৃত্যু হয়। আর ৫ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের মৃত্যুর কারণ মূলত শারীরিক আঘাত। বিশেষ করে পানিতে ডুবে কিংবা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

তবে শূন্য থেকে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। প্রসবকালীন জটিলতায় মাতৃমৃত্যু রোধেও সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এ অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মান আরো বাড়াতে হবে। অবশ্যই পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান সারাদেশে, বিশেষ করে গ্রামেও ছড়িয়ে দিতে হবে।

রোহিঙ্গা এতিম শিশুদের তালিকা করা হচ্ছে

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের শরণার্থী বিষয়ক সেলের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য অনুযায়ী গত বছরের ২৫শে আগস্ট থেকে চলতি বছরের ২২শে জুলাই পর্যন্ত রোহিঙ্গা শিবিরে এতিম শিশুর সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৪১। এদের মধ্যে ৮ হাজার ৩৯১ শিশুর মা-বাবা কেউ নেই।

জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফের সহায়তায় সমাজ সেবা অধিদপ্তর রোহিঙ্গা শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এতিম শিশুর তালিকা করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাস পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার ৬০৫টি ফস্টার কেয়ার গিভার (আত্মীয় বা অন্য যে-কোনো পরিবারের সঙ্গে শিশুকে রাখা হচ্ছে) পরিবারকে এতিম শিশুর জন্য ২ হাজার টাকা হারে ৩২ লাখ ১০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিটি নাগরিকের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের

একটি বাগানে বিভিন্ন রং ও বর্ণের ফুল থাকলে বাগানটিকে সুন্দর দেখায়। তেমনি বাংলাদেশও একটি ফুলের বাগানের মতো। এখানে বিভিন্ন জাতিধর্মবর্ণ-গোত্রের নানান ধরনের মানুষ আছে বলেই বাংলাদেশ এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়। সংবিধান অনুযায়ী এদেশের প্রতিটি নাগরিকের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বলেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরাম এবং বাংলাদেশ মণিপুরী আদিবাসী ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর

মন্ত্রী ১১ই সেপ্টেম্বর মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নস্থ তেতইগাঁও গ্রামের মণিপুরী কালচারাল কমপ্লেক্স-এ 'বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ফোরাম' ও 'বাংলাদেশ মণিপুরী আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ফোরাম'-এর যৌথ উদ্যোগে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মণিপুরী, খাসি, ত্রিপুরা, গারো, রাজবংশী, সাঁওতাল, ওঁরাও এবং চা শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশ ও মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু এবং শিশুশিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অনেক বেশি। এ পর্যন্ত আমাদের সরকারিভাবে স্বীকৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫০টি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সংস্কৃতি চর্চা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করতে কাজ করে যাচ্ছি। তাই সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে চা বাগান এলাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে'।

স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মণিপুরী আদিবাসী (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সমরজিত সিংহ। এর আগে মন্ত্রী মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির ওয়েবসাইট উদ্‌বোধন করেন এবং মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সনদ সহজীকরণ' বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রত্যক্ষ করেন।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী

বিপুল সংখ্যক শিল্পরসিকের আগমনে জমজমাট 'দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী-২০১৮' ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হয়। আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীর আঠারোতম আসরে চোখ জুড়ানো শিল্প কর্মের সাথে যুক্ত হয় শিল্পসংক্রান্ত সেমিনার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত এ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও প্রদর্শনীর পর্যবেক্ষক জাপানের এমিরেটাস অধ্যাপক তেতসুয়া নোদাসহ অনেক গুণিজন।

এবারের প্রদর্শনীতে দেশি-বিদেশি ৪৬৫ জন শিল্পীর ৫৮৩টি শিল্পকর্ম উপস্থাপিত হয়। এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো এই প্রদর্শনী চলে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় জাতীয় কবিকে স্মরণ

বাংলা কবিতার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম প্রয়াণ দিবস ১২ই ভাদ্র (২৭শে আগস্ট)। এদিন জাতি তাঁকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় স্মরণ করে ফুলে ফুলে ভরে দেয় তাঁর সমাধি।

নজরুল সংগীতে বিশেষ অবদান রাখায় খায়রুল আনাম শাকিল ও নজরুল সংগীত গবেষণায় নজরুল ইনস্টিটিউট প্রবর্তিত নজরুল পুরস্কার-২০১৭ পান জাতীয় অধ্যাপক রশিদুন নবী। জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে নজরুল ইনস্টিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিকের জন্মবার্ষিকী পালিত

বাহান্নর ভাষা সংগ্রামী, একাধারে কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক আহমদ রফিকের ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশ ও অনিন্দ্যপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

শিল্পী শাহাবুদ্দিন-এর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শিল্পকলা একাডেমিতে ১১ই সেপ্টেম্বর জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে বসে শিল্পী শাহাবুদ্দিনের ৬৯তম জন্মদিনের আসর। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী ও জন্মদিন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উদ্‌বোধন শেষে প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন–পিআইডি

উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মান্নান। শিল্পী শাহাবুদ্দিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত– এমন মন্তব্য করে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, 'তিনি আমাদের অহংকার'।

আয়োজনের শুরুতেই ছিল সুরের মূর্ছনা। এরপর শিল্পীর ওপর নির্মিত পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা অজেয় রায়ের তথ্যচিত্র 'কালার অব ফ্রিডম' প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

যৌন হয়রানি ঠেকাতে ৮ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

হলিউডে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ঠেকাতে ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে 'মিটু' ও 'টাইমস আপ' কর্মসূচি। তেমনি বাংলাদেশেও 'আই স্ট্যান্ড ফর ওম্যান' নামে একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর অংশ হিসেবে দেশের ৮ জন নির্মাতা নির্মাণ করেন ৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে– আফজাল হোসেন মুন্নার 'দ্য ওন্ডম্যান অ্যান্ড দ্য গার্ল', জসীম আহমেদের 'চকোলেট' সাকি ফারজানার 'দ্য পার্ক, দ্য বেঞ্চ অ্যান্ড দ্য গার্ল', প্রতীক সরকারের 'মুখোশ' আশিকুর রহমানের 'অসম্ভাবিত' রাজু আহসানের 'লিপস্টিক' আসিফ খানের 'দ্য মাদার' এবং আর খিজির হায়াত খানের পিএসএ'র নাম 'সে নো টু রেপ'।

তিন আন্তর্জাতিক উৎসবে 'হালদা'

জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা তৌকীর আহমেদের 'হালদা' ছবিটি তিনটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে। সেগুলো হলো– কসোভোতে ১১তম ফিল্ম ফেস্টিভাল দ্য গভর্নেন্স অন দি থ্রোন, রাশিয়াতে ১৪তম কাজান ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভাল অব মুসলিম সিনেমার মূল প্রতিযোগিতা ও ইতালিতে ২১তম রিলিজিয়ন টুডে ফিল্ম ফেস্টিভাল। এছাড়া ছবিটি লন্ডনে ১৫তম রেইনবো চলচ্চিত্র উৎসব, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

১৪তম ইউরেশিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রান্ডপিক্স পুরস্কারে ভূষিত 'মীনালাপ'

এশিয়ার পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সর্ববৃহৎ ইউরেশিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত। এ উৎসবের স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে গ্রান্ডপিক্স পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশি নির্মাতা সুবর্ণা সেঁজুতি টুসি পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'মীনালাপ'। এই প্রথম উপমহাদেশের কোনো নির্মাতার চলচ্চিত্র পুরস্কৃত হলো।

ঈদুল আযহায় মুক্তি পায় ৬টি চলচ্চিত্র

ঈদ-উল-আযহায় মুক্তি পায় ৬টি চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্রগুলো হলো– ক্যাপ্টেন খান, অন্ধকার জগৎ, বেপরোয়া, জান্নাত, মনে রেখো এবং মাতাল।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বড়ো ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে হারালো বাংলাদেশ

এশিয়া কাপের উদ্‌বোধন ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বিশাল রানের ব্যবধানে জয় পেল বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ে মুশফিকুর রহিমের সেরা সেঞ্চুরি আর বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শ্রীলঙ্কাকে ১৩৭ রানের বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে ম্যাচের শুভ সূচনা করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এ জয়ের ক্ষেত্রে বলতে গেলে একক কৃতিত্ব মুশফিকের। কারণ বাংলাদেশের ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪৪ রান এসেছে তার ব্যাট থেকেই। তাই ম্যাচ শেষে মুশফিকই হলেন বিচারকদের দৃষ্টিতে ম্যাচ সেরা। তার হাতেই তুলে দেওয়া হলো সেরার পুরস্কার।

লেবাননকে ৮ গোলে হারালো বাংলাদেশ

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে লেবাননকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে বাংলার কিশোরীরা। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দুপুরে কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে শুরু হয় ম্যাচটি। এ জয়ে বাংলাদেশ দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাহরাইনকে ১০-০ গোলে হারিয়েছিল এই কিশোরীরা। ফের বড়ো জয় পেল বাংলাদেশ।

প্রথমার্ধে বাংলাদেশ লেবাননের জালে দিয়েছিল ৫ গোল। দ্বিতীয়ার্ধে আরো ৩টি। দুটি করে গোলের দেখা পান সাজেদা, তহুরা ও শামসুন্নাহার। একবার করে জালে বল পাঠান আনাই ও রোজিনা।

ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

ওয়ালটন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি বধির ক্রিকেটের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারতকে ৮ উইকেটে হারায় স্বাগতিকরা। বধির ক্রিকেটে এশিয়ার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত। কিন্তু ওয়ালটন ত্রিদেশীয় সিরিজে তাদের পারফরম্যান্স তলানিতে। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ বড়ো ব্যবধানে হেরে গেছে তারা। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম মুখোমুখিতে ম্যাচ ড্র করেছিল ভারত। টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে ৮০ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। জবাবে ১৩.৪ ওভারে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে বাংলাদেশ। মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে জয় পায় বাংলাদেশ।

প্রতিবেদক: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে সেপ্টেম্বর : স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯	জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫০	ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু
২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৭	আধুনিক অলিম্পিকের জনক ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তোর মৃত্যু
২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি
৩রা সেপ্টেম্বর ১৭৮৩	যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন 'প্যারিস চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি
৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৯৮	রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের জন্ম
৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮১	CEDAW সনদ কার্যকর
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮০	হজরত শাহজালাল (র) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	প্রখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিদ আল বিরুনীর মৃত্যু
৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১	যশোরের গোয়ালহাটিতে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	বিশ্বের অবহেলিত মানুষের 'মা' খ্যাত মাদার তেরেসার মৃত্যু
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫	দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু
৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩	আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা INTERPOL গঠিত
৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪	বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম
৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২	অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০	জেনেভা কনভেনশন অনুমোদন করে বাংলাদেশ
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩	শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের মৃত্যু
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬	পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত
১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১	যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে '৯/১১' নামে পরিচিত ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে
১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪	ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০	রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে 'জার্মান একত্রীকরণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত
১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৯	বাংলাদেশের বাউল গানের শিল্পী শাহ আব্দুল করীমের মৃত্যু
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪	রম্য রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬	'অপরাজেয় কথাশিল্পী' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ
১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৪	জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সাংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাস
১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' স্বাক্ষরিত
১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১	বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩	প্রথম দেশ হিসেবে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে নিউজিল্যান্ড
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯	গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত
২২শে সেপ্টেম্বর ১৭৯১	ইংরেজ রসায়নবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম
২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০	৮ বছরব্যাপী ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু
২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৬	সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কৃত
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৫	জাতিসংঘে ১৭টি লক্ষ্য সংবলিত SDG গৃহীত
২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২০	শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম
২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩	ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু
২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৬	সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যু
২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৫	বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের পরলোকগমন
২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮	আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন
২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭	বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০২	প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি প্রকল্প চালু
৩০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৩	পুঁথি সংগ্রাহক ও লেখক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের মৃত্যু।

সৈয়দ মুজতবা আলী

রম্য সাহিত্য রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতের আসামে পিতার কর্মস্থল করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস সিলেটের মৌলভী বাজার জেলায়। তাঁর বাবা সৈয়দ সিকান্দার আলী পেশায় সাব-রেজিস্টার ছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী সিলেটের গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে কলকাতার শান্তি নিকেতন ভর্তি হন। ১৯২৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯২৭ সালে কাবুলের কৃষি বিজ্ঞান কলেজে ফারসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক পদে প্রায় ২ বছর নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি ১৯২৯-১৯৩১ সাল পর্যন্ত জার্মানির বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ভারতের বারোদা কলেজে ১০ বছর ১৯৩৫-১৯৪৪ পর্যন্ত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এছাড়া তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'সত্যপীর' নামে এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় 'রায়পিথোরা' নামে উপ-সম্পাদকীয় (১৯৪৫-৪৯) রচনা করেন। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এসময় কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কারণে সৈয়দ মুজতবা আলীকে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের রোষানলে পড়তে হয়। এছাড়া তাঁর 'পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা' বইটিও সরকারের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় তাঁকে কৈফিয়ত তলব করে ক্ষমতাসীন সরকার। ১৯৪৯ সালের ৮ই আগস্ট চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ভারতে যান। এরপর তিনি কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক এবং পরে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালের ২৯শে এপ্রিল ডাইরেক্টর পদে নয়াদিল্লির বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৬১-এর ১৮ই আগস্ট বিশ্বভারতীর রিডার নিযুক্ত হন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় পাণ্ডিত্য ও সৃজন ক্ষমতার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। সরস মার্জিত ভাষা এবং ব্যঙ্গ ও রঙ্গ-রসিকতাময় উপস্থাপনা তাঁর সাহিত্যকর্মকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে– দেশে-বিদেশে (১৯৫৬), পঞ্চতন্ত্র (১৩৫৯) চাচাকাহিনী (১৯৫৯), ময়ূরকণ্ঠী (১৩৫৯), জলে-ডাঙায় (১৩৬৭), শবনম (১৩৬৭), টুনিমেম (১৩৭০), বড়বাবু (১৩৭২), শহর-ইয়ার (১৩৭৬), কত না-অশ্রুজল (১৩৭৮) ইত্যাদি।

তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠি, গুজরাটি, ইংরেজি, ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষায় দক্ষতা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও তার তুলনামূলক বিচার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের নিষ্ঠাবান ভক্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলী ভারতে অবস্থানকালে ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৭৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সৈয়দ মুজতবা আলী পরলোকগমন করেন।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি